ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান

রচনায়: শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রউফ শামীম সাহেব

সম্পাদনায়: শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান

শায়খুল হাদীস
মওলানা আব্দুর রঊফ শামীম সাহেব
সম্পাদনায়
আব্দুল হামীদ মাদানী

ভূমিকা

[illegible]

মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত বা করুণা করেই প্রেরণ করেছি। *(সূরা আম্বিয়া ১০৭ আয়াত)*

তাই আমরা তাঁকে সারা দুনিয়ার সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য হিদায়াতের জ্বলন্ত ভাস্কররূপে দেখতে পাই। যখন তাঁকে একজন আদর্শপরায়ণ সুপুত্র রূপেও দেখতে পাই - তখন তাঁকে উত্তম পিতা রূপেও দেখতে পাই। আবার যখন তাঁকে একজন আদর্শ মুবাল্লিগ বা সুকৌশলী ধর্মপ্রচারক রূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায়, তখন তাঁকে আমরা একজন বিজয়ী সিপাহ্সালার রূপেও দেখতে পাই। এই ভাবেই তাঁকে আমরা তখনই 'আবেদ' ও তাপসপ্রবর রূপে দেখি - পরক্ষণেই আবার তাঁকে একজন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী, ন্যায়-নিষ্ঠাবান সম্রাট এবং নিরপেক্ষ বিচারপতি রূপেও দেখতে পাই। যেখানে তিনি একজন অতুলনীয় দানশীল, সেখানে আবার তিনি একজন তুলনাহীন আদর্শ ব্যবসায়ী। আবার যেখানে তিনি একজন নজীরহীন শিক্ষাগুরুর আসন অলংকৃত করে আছেন - সেখানে তিনি আবার একজন সদালাপী, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে রসিকতাপ্রিয় ব্যক্তিরূপে সমাসীন। যেখানে তিনি

একজন যুগ-সংস্কারক হয়ে বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রের মাঝে সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছেন, সেখানে আবার পরক্ষণে দেখি যে, তিনি একজন ভেষজবিদ ও সুচিকিৎসক রূপে বিভিন্ন রুগীর রোগ নিরাময় কল্পে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র দান করতে ব্যস্ত আছেন। একেই বলে - সত্যিকার অর্থে 'বহুমুখী আদর্শ জীবন'। এই কারণে দেখতে পাই - তাঁর জীবনী সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক গ্রন্থরাজি। পৃথিবীর প্রায় সকল জীবন্ত ভাষায় রচিত যত গ্রন্থ তাঁর জীবনের উপর পরিলক্ষিত হয় - অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনী বিষয়ক অত গ্রন্থ পরিদৃষ্ট হয় না। হ্যাঁ, কোন কোন মনিষীর জীবনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা হয় তো বেশী আছে - তা স্বীকার করি ; কিন্তু তা আদৌ আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর মত বহুমুখী নয় এবং অত বেশী সংখ্যকও নয়।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু ভাষায় বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আজকের অবসরে এই নগণ্য সেবক তাঁর জীবনের কেবল একটা দিক নিয়ে সম্যক আলোচনা করার সদুদ্দেশ্যে এই পুস্তকের অবতারণা করেছে। সেটি হচ্ছে তাঁর স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় দিক। কুরআন ও হাদীস ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বহু গ্রন্থ ঘেঁটে বিষয়টি পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলতে কোন কসূর করিনি।

পরিশেষে আমি আমার ঐ সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও স্নেহভাজন ছাত্রগণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, যাঁরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রকাশন কল্পে কেউ অগ্রিম গ্রাহক হয়ে ও কেউ অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহ করে এবং কেউ এককালীন সাহায্য দান করতঃ আমাকে উৎসাহিত ও পরম উপকৃত করেছেন। সেই সঙ্গে আল্‌সিনাহ প্রেসের মালিক স্বনামধন্য মওলানা মুহতারাম জনাব আবুল বাশার সাহেবেরও আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি - যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করে বইটির নিখুঁৎ মুদ্রণের চেষ্টা করতে কোন ত্রুটি করেন নি।

[illegible]

অনেক চেষ্টা করেও হয়ত কিছু রচনার ভুল অথবা মুদ্রণ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে। অতএব প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ, সেগুলির প্রতি সংশোধনী দৃষ্টিপাত করতঃ বন্ধুত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় দিবেন।

বহু বিনিদ্রিত রজনীর এটা তৈরী ফসল। এর থেকে জনগণ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ পাক আমাকে এর 'নেক বদলা' দান করেন - মনের এই প্রার্থনা! আমীন!!

বিনীত--
আব্দুর রউফ শামীম,
খাদেম,
মাদ্রাসা রিয়াযুল উলুম
মহিষাডহরী। বীরভূম।

তারীখ ঃ
৩০ শে অক্টোবর ১৯৮৪ খৃঃ
১৩ই কার্ত্তিক ১৩৯১ সাল।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

***

প্রথম অধ্যায়

শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিজ্ঞান

দুনিয়ার সমগ্র চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নিকটে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধিসমূহ পালন করার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানগুলি মেনে চললে মনুষ্য-শরীর যেমন রোগমুক্ত থাকে - তেমনি স্বাস্থ্য অটুট ও অক্ষুন্ন থাকে, মন-মানসিকতা সুপ্রসন্ন থাকে। বলা বাহুল্য, যখন দেহ-মন নীরোগ নীরোগ ও প্রসন্ন থাকে তখন ধর্ম-কর্ম, আহার-বিহার, শয়ন ও স্বপন সবই সুষ্ঠু ও নিখুঁৎভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণেই আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক বিধান তাঁর প্রিয় উম্মত (অনুসারী)গণকে দান করে গেছেন। এখানে তাই সর্বাগ্রে তাঁর প্রদত্ত সেই বিধানগুলির কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করতে প্রয়াস পাব।

. [illegible]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ঘর-বাড়ী, বিছানাপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ও নিজের দেহকে পাপ-পবিত্র রাখার প্রতি ইসলাম খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। বলা হয়েছে, [illegible] অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্দ্ধেকাংশ। *(সহীহ মুসলিম, মিরআতুল মাফাতীহ ১ম খন্ড ৩৬৫ পৃঃ)*

উপরোক্ত উক্তি থেকে আমরা সহজেই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি। কারণ, একে ঈমানের অর্ধেক অংশ বলা হয়েছে। ঈমান আনয়নে পূর্বতন সগীরা-কবীরা (ছোট-বড়) সব রকম পাপ মোচন হয়ে যায়। আর ওযু-

গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনে সগীরা গুনাহ (ছোট পাপ) সমূহ মার্জনা করে দেওয়া হয়। অতত্রব এই অর্থে পবিত্র থাকা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা ঈমানের অর্দ্ধেকাংশই হচ্ছে। *(মিরআত ১ম খন্ড ৩৬৫ পৃঃ)*

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ কুরআনে হাকীমে বর্ণনা করেছেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তোওবাকারী (পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী) ও পবিত্রতা অর্জনশীল মানুষদেরকে অবশ্যই ভালবাসেন। *(সূরা বাকারাহ ২৮ রুকু)*

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে মিসওয়াক (দাঁতন) করার গুরুত্ব

সভ্য জগতে প্রাতঃকালে দাঁতন করা একটা সভ্যতার পরিচায়ক - এতে কোন সন্দেহ নেই। বাহ্য-দৃষ্টিতে দাঁতন করা একটা ক্ষুদ্র কাজ বলে মনে হলেও গভীর দৃষ্টিতে তা ক্ষুদ্র নয়। ওর আধ্যাত্মিক উপকারিতার কথা আপাততঃ স্থগিত রাখলেও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ওর যে উপকারিতা রয়েছে তা অপরিসীম। দাঁত, মাঢ়ী, জিহ্বা, গলা এবং মস্তিষ্কের দূষিত পদার্থগুলিকে দাঁতন ব্যবহারে যত সহজে নির্গত করা যায় - অন্য কোন প্রক্রিয়ায় অত সহজে নির্গত করা সম্ভব হয় না। তাই স্বাস্থ্যরক্ষাবিদ হযরত রসূলে করীম ﷺ কথায় ও কর্মে দাঁতন ব্যবহারের উপর বেশ জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "আমার উম্মতের উপর কষ্ট বোধ হবে - এই আশঙ্কা না থাকলে প্রত্যেক নামাযের সময় (দৈনিক পাঁচবার) দাঁতন করার অপরিহার্য্য নির্দেশ দিতাম। *(বুখারী ১২২ পৃঃ)*

অন্যত্রে তিনি আরো বলেছেন, "দাঁতন করে নামায পড়লে বিনা দাঁতন অপেক্ষা ৭০ গুণ বেশী সওয়াব (পূণ্য) লাভ হয়।" আর একটি হাদীসে তিনি বলেন, "হযরত জিব্রাইল ﷺ আমার কাছে যখনই আসেন - তখনই আমাকে দাঁতন করার উপদেশ দেন। ফলে (আমি এত বেশী দাঁতন ব্যবহার করি) মনে ভয় হয় যে, হয়ত মুখের সামনের দিক ছিলে যাবে।" তাছাড়া রাত্রে তাহা জ্জুদ নামায পড়ার উদ্দেশ্যে হুযুর ﷺ উঠলেই প্রথমতঃ তিনি বেশ ভালোভাবে দাঁতন করতেন। *(বুখারী,*

মুসলিম, মিশকাত ৪৪ পৃঃ)

মানুষের জন্মগত ও স্বভাবজাত ১০টি গুণাবলীর মধ্যে দাঁতন করাটাও একটা বিষেশ গুন বলে হাদীস গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদের একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, "দাঁতন মুখগহ্বরের শুদ্ধিতা ও পবিত্রতা আনয়নে সহায়ক এবং দয়াময় প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের একটি উপায়।" *(মিশকাত ৪৪ পৃঃ)* বুখারী শরীফের একটি হাদীসে হুযুর ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে দাঁতন করার ব্যাপারে খুব বেশী বেশী আদেশ-উপদেশ প্রদান করছি।" *(বুখারী ১২২ পৃঃ)*

আধুনিক কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ দন্তরোগের উৎপত্তির কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে যে গবেষণাতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন - সে গবেষণার মূলতত্ত্ব আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নবী মুহাম্মাদ ﷺ প্রকাশ করে দিয়েছেন।

পাকাশয়ের গন্ডগোল হেতু রক্তদোষজনিত দন্তরোগ 'পায়োরিয়া' (মাঢ়ী ফুলা, ব্যথা হওয়া ও পুঁজ নির্গত হওয়া) একটা কঠিন ব্যাধি। এই রোগে পাকাশয় দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যায়। পরিশেষে স্বাস্থ্যহানীর শিকার হতে হয়। এর প্রতিকার ব্যবস্থা আধুনিক কালে দাঁত তুলে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই মারাত্মক পরিস্থিতির হাত থেকে অব্যাহতি পাবার খুব সহজ ব্যবস্থা - যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন দন্তবিশেষজ্ঞের নিকট ফী দিতে হয় না, দাঁত তুলে ফেলারও কষ্ট পেতে হয় না। সেটা হচ্ছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী হযরত রসূলে করীম ﷺ-এর দেওয়া 'দাঁতন ব্যবস্থা'। তাঁর উপদেশ মত পাকাশয়ের উপর অতিভোজনের চাপ না দেওয়া এবং দৈনিক পাঁচবার করে দাঁতন করা হলে আল্লাহানুগ্রহে ঐ দুষ্টব্যাধি হয় না। অতি ভোজন না করে পরিমিত স্বল্প ভোজনের অভ্যাস করলে পাকাশয় সুস্থ ও হজমক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে। তার ফলে রক্তদোষজনিত ঐ ব্যাধি হবে না। সেই সঙ্গে যদি সকাল-সন্ধ্যা, দিনে-রাতে চার-পাঁচবার করে দাঁতন করা হয়, তাহলে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা ভুক্ত-দ্রব্যগুলি এবং আরো অন্যান্য লালা-রস সমূহ সহজে বের হয়ে যাবে। পচে গিয়ে তা আর দন্তরোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না।

"অভিজ্ঞতায় আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, বরাবর দাঁতন ব্যবহারের অভ্যাস থাকলে মুখ ও পাকাশয়ের ব্যারাম দূরীভূত হয়, সর্দি কাশীর আক্রমণ থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং দৃষ্টি শক্তি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।" *(রাহবারে কামেল ১৬৯ পৃঃ)*

কৃত্রিম ব্রাশ ইত্যাদি দাঁতন হিসাবে ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক গাছ-গাছড়ার দাঁতন করা উত্তম। হাদীস গ্রন্থে তিনটি গাছের দাঁতন ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ-

১। পীলু (ডাল ও শিকড়) ২। যয়তুনের ডাল। ৩। খেজুরের ডাল। এই তিনটি গাছের উপর বিস্তৃত আলোচনাও রয়েছে। বিশেষ করে যয়তুন সম্পর্কে হুযুর ﷺ-এর মন্তব্য হচ্ছে, "ওটির দাঁতন খুব ভালো। যয়তুন কুরআনে বর্ণিত বরকতপূর্ণ গাছ। ওর দ্বারা মুখগহ্বর শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। আর এটা আমার দাঁতন এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণেরও দাঁতন।" *(মিরআতুল মাফাতিহ ১ম খন্ড ৪৪০ পৃঃ)*

তবে যে সব ক্ষেত্রে উপরোক্ত গাছের দাঁতন দুষ্প্রাপ্য, সে সব ক্ষেত্রে আমাদের নিম, জামাল কোঠা ইত্যাদি গাছেরও দাঁতন ব্যবহারে আপত্তি নেই। এই গাছগুলির ভেষজগত গুণাবলী দাঁত ও মাঢ়ীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(দাঁতন প্রবন্ধটি 'আহলে হাদীস' পত্রিকার পৌষ ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত)

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে ওযু-গোসল ও নামাযের গুরুত্ব

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহকারে দেখেছেন যে, বায়ুমন্ডলীতে যে সব ধূলিকণা উড়তে থাকে তাতে কোটি কোটি দূষিত জীবাণু ও বিষাক্ত বীজাণু মিশে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাকের ছিদ্র দিয়ে এবং মুখগহ্বর বেয়ে সেই সব বীজাণু পেটে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক বীজাণুর ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, তারা নাসিকারন্ধ্রে ও মুখ গহ্বরে আটকে থাকে। ওযু করাকালে তাই তিনবার কুল্লী করা ও তিনবার পানি টেনে নাক ঝেড়ে ফেলার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এতে আটকে থাকা রোগ-জীবাণুগুলি সহজে দূরীভূত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, শরীরে আর যে সব অঙ্গ অনাবৃত থাকায় তাতে ধূলিকণা জমার সম্ভাবনা থাকে (যেমন - পূর্ণ মুখমন্ডল, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা গাঁইট পর্যন্ত) এগুলিকেও তিনবার করে ধুয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কান ও মাথার মাসাহ (অর্থাৎ - পানিসিক্ত হাত ও হাতের অঙ্গুলী বিশেষ প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন) করার বিধান প্রদত্ত হয়েছে। এইভাবে ওযু করার ব্যবস্থা দিবা-রাত্রে পাঁচবার করে গ্রহণ করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। এই ব্যবস্থাতে আমাদের শরীর যে সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত ও বীজাণুমুক্ত হয়ে থাকবে, তাতে আর কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না।

সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর রাত্রিকালে যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, তখন শরীরে

আভ্যন্তরীণ দূষিত বস্তুগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের নালী দিয়ে ও লোমকূপ দিয়ে যেমন বের হয়ে থাকে, তেমনি (আধুনিক গবেষণা অনুসারে) বায়ুমন্ডলীতে অগণিত রোগ বীজাণু মিশ্রিত ধূলিকণাগুলিও শরীরের বাহ্য-ইন্দ্রিয় সমূহতে জমতে থাকে। তাই রাত্রিশেষে উষালগ্নে মানুষ যখন শয্যাত্যাগ করে, তখন মল-মূত্রাদির কাজ সেরেই তাদেরকে ফজরের নামায উদ্দেশ্যে ওযু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে পানি দ্বারা ওযু করবে সে পানিও বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া দরকার। এমন কি হাদীস গ্রন্থে বলা হয়েছে, "উভয় হাতের কব্জী পর্যন্ত বেশ ভালভাবে ধৌত না করা পর্যন্ত যেন কেউ তার হাত ওযুর পানিতে না ডুবিয়ে দেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, ঘুমন্ত অবস্থায় কোথায় কিভাবে হাত লেগেছে।" অতএব উষাকালে (সুবহে সাদেক) ইসলামী বিধান মত ওযু করলে; অর্থাৎ দাঁতন করতঃ তিনবার কব্জি পর্যন্ত হাত ধুয়ে তিনবার কুল্লী করা, তিনবার নাকের ছিদ্রে পানি টেনে নাক ঝেড়ে ফেলা, পূর্ণ মুখমন্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করা, মাথা ও কানের মাসাহ (সিক্ত হাত ফিরানো) এবং উভয় পায়ের গাঁট পর্যন্ত ভালভাবে ধুয়ে ফেলা হলে নিঃসন্দেহে শরীরে জমে থাকা ধূলীকণা ও রোগজীবাণুগুলি দূরীভূত হয়ে যায়। তারপর সকাল বেলায় যখন সে নিজে সাংসারিক কাজে নিমগ্ন হবে, তখন সে নতুন মন-মেজাজ, বিশুদ্ধ দেহ-মন নিয়েই কাজ করার প্রয়াস পাবে। দুপুরের পানাহার উদ্দেশ্যে মানুষ আর একবার কাজ-কর্ম থেকে অবকাশ গ্রহণ করে। এ সময়েও তাই তাদেরকে আর একবার ওযূ করার নির্দেশ আরোপ করা হয়েছে যাতে কর্মাবস্থায় ঘর্মাক্ত শরীরে জমে থাকা ময়লাগুলি ও তৎসহ রোগবীজাণুগুলি পরিষ্কৃত হয়ে যায়। এইভাবে বৈকালে একবার, সূর্য্যাস্তের পর একবার এবং রাত্রিকালে শয়ন করার পূর্বে একবার উপরোক্ত নিয়মে প্রতিদিন যদি পাঁচবার করে ওযু করা হয়ে থাকে, তবে আমাদের দেহে ময়লা ও দূষিত বীজাণু জমে থাকার মোটেই সুযোগ থাকবে না। সেই সঙ্গে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপরোক্ত প্রাত্যহিক পাঁচবার করে ওযু করার পর ইসলাম যে পঞ্চবার নামায পড়ার কড়া নির্দেশ দান করেছে - তা যদি পালন করা হয় তবে তো আর কথাই নেই। নামাযের আধ্যাত্মিক গুণাবলী যা আছে তা তো আছেই; উপরন্তু ওর দ্বারা আমরা হালকা ধরনের একটা ব্যায়াম বা শরীর চর্চারও একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাই - যা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যায়ামের গুরুত্ব স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অপরিসীম।

এবারে আসুন, গোসল বা সর্বাঙ্গ শরীর ধৌত করার বিষয়টিকে নিয়ে একটু

পর্যালোচনা করে দেখি। এ ব্যাপারে পৃথিবীর শীত, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ ঋতু ও অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য রেখেই দৈনিক গোসল করা বা না করার ব্যাপারটি মানুষের ইচ্ছাধীনে রাখা হয়েছে। কিন্তু সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গোসল করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ইসলাম নির্দেশ আরোপ করেছে। যথা,

[illegible]

অর্থাৎ, জুমআহ পড়তে যে কেউ উপস্থিত হবে সে যেন গোসল করে নেয়। *(বুখারী ১২০ পৃঃ)*

সাপ্তাহিক একবার করে গোসল করাকে অবশ্য-কর্তব্য বলে নির্দেশ আরোপিত হয়েছে। এতে শরীর স্বাস্থ্যের অনেক কল্যাণ নিহীত আছে। ওযুর বাহ্য-অঙ্গগুলি ছাড়া শরীরের আর অন্যান্য অংশগুলিতে যে ময়লা জমে থাকে, সেগুলি খুব বেশী দিন অবস্থান করতে দিলে শারীরিক ও মানসিক নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাই অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একদিন গোসল করার প্রতি এত কঠোরভাবে নির্দেশ দান করা হয়েছে।

এ ছাড়াও স্ত্রী-সহবাস করার ফলে যেহেতু দেহের আভ্যন্তরীণ অপদার্থ বস্তুগুলি ঘামের সঙ্গে লোমকূপের দিকে বের হয়ে আসে - সেই হেতু যখনই কেউ স্ত্রী-সহবাস করবে অথবা স্বপ্নদোষজনিত কারণে (অথবা অন্য কোন প্রকারে তার) বীর্যপাত ঘটবে তখন তাকে গোসল করতে হবে। এক্ষেত্রে গোসল করাকে ইসলাম ফরয বলে ঘোষণা দান করেছে; অর্থাৎ বিনা কারণে যা পরিহার করার কোন উপায় নেই। এমনকি গোসল করা কালে একটি লোমও যাতে শুষ্ক না থাকে সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সুস্বাস্থ্যের জন্য মনের প্রসন্নতা একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। মন-মস্তিষ্ক সুপ্রসন্ন থাকলে শরীর-স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। বলা বাহুল্য যে, স্ত্রী-সহবাস হেতু অথবা স্বপ্নদোষজনিত বীর্যপাত ঘটলে শারীরিক অপবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক অপ্রসন্নতা এ একটা অস্বস্তিভাবও অনুভূত হয়ে থাকে। এই অপ্রসন্ন ও অস্বস্তিকর ভাব দূর করবার সহজ ও বিশুদ্ধ ব্যবস্থাই হচ্ছে গোসল বা স্নান করা।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে পরিমিত আহার ও উপবাসের গুরুত্ব

ডাক্তারগণের নিকট পাকাশয় যন্ত্রটি একটি যাঁতা বা চাকীর মত। ভুক্ত দ্রব্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পেষণ করতঃ ওর থেকে তৈরী তরল আকারে সারপদার্থকে সে যকৃতে (Liver) পৌঁছে দেয়। যকৃতে এসে ঐ সারনির্যাস থেকে রক্ত তৈরী হয়। আর হৃৎপিন্ড (Heart) একটি স্বয়ংক্রিয় 'পাম্প' বিশেষ। তার কাজ হচ্ছে অশোধিত রক্তকে ভেন বা শিরাপথে সংগ্রহ করে বিশোধিত করার জন্য ফুসফুসে প্রেরণ করা। অতঃপর সেই বিশুদ্ধ রক্তকে ধমনী পথে সর্বাঙ্গ শরীরে প্রেরণ করতে থাকা।

এবারে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যে চাকী দিবারাত্র অবিরাম চলতে থাকে - সে চাকী খুব শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে চাকী মাঝে মাঝে বন্ধ রেখে চালু রাখা যায়, তা অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঠিক এই উদাহরণ মানুষের পাকাশয় সম্পর্কে পেশ করা চলে। সমীক্ষা চালিয়ে ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন রোযাদার ও স্বল্পভোজী ব্যক্তির শরীর-স্বাস্থ্য বে-রোযাদার ও অতিভোজনকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী হয়। রোযা ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রিত করে। আর ষড়রিপু নিয়ন্ত্রনে উন্নত চরিত্র গঠন হয়। এ ছাড়া গোটা বছরে মনুষ্য শরীরে যে সব দূষিত পদার্থ জমে গিয়ে থাকে, (রোযার উপবাসহেতু) সেই সব দূষিত পদার্থ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং হজমক্রিয়ার জন্য যে গ্রাষ্ট্রিক যুস বা পাকাশয়িক রস কাজ করে তাকে রোযার উপবাস পরিশোধিত করে তুলে। ফলে হজমক্রিয়ার উন্নতি হয় এবং বিশুদ্ধ রক্ত তৈরী হয়ে শারীরিক কাঠামো মজবুত করতে সহায়তা করে।

হাদীস শরীফে দেখতে পাওয়া যায় যে, হুযুর ﷺ রমযান মাস ছাড়া সাধারণতঃ প্রতি মাসেই রোযা রাখতেন। বিশেষতঃ প্রতিমাসে তিনটি রোযা রাখতেনই। সেই সঙ্গে তাঁর অনুগামী ভক্তদের (সাহাবা)কেও এই শিক্ষা দান করতেন।

হুযুর ﷺ যখন আহার করতেন তখন পরিপূর্ণ পেট খেতেন না; বরং স্বল্পভোজন করতেন এবং উপদেশ দিতেন, "পাকস্থলীকে তিনভাগে ভাগ করা উচিত; একভাগ

আহারের জন্য, একভাগ পানী পান করার জন্য, আর একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য।" তিনি ইহাও বলতেন, "যতক্ষণ ভালভাবে ক্ষুধা না লাগবে ততক্ষণ আহার করো না এবং পানাহার করার সময় একটু ক্ষুধা থাকতেই হাত উঠিয়ে নিও।" *(কিমইয়ায়ে সাআদাতের উর্দূ অনুবাদ আকসীরে হিদায়াত ১৩৩ পৃঃ)*

শরীর ও স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য উপরে বর্ণিত নিয়মটা এমন সুচিন্তিত নিয়ম - যাকে আজ দুনিয়ার সকল জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যতদিন মুসলিমগণ উপরোক্ত স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান মান্য করে চলেছে, ততদিন তারা হেকীম, ডাক্তার, কবিরাজের মুখাপেক্ষী কম হয়েছে। পক্ষান্তরে যখনই তারা তাদের পথ প্রদর্শক নবী করীম ﷺ-এর উপরোক্ত জীবনব্যবস্থা ও বিধান পরিত্যাগ করতে অভ্যস্ত হয়েছে তখনই তারা রকমারি ব্যাধি ও রোগের শিকার হয়েছে।

এ স্থলে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশন করতে দ্বিধা নেই যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে জনৈক বাদশাহ মুসলমানদের সেবা-উদ্দেশ্যে তাঁর একনিষ্ঠ এক চিকিৎসাকে মদীনা নগরে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এখানে এসে বেশ কিছু কাল যাবৎ অকেজো অবস্থায় বসে থাকেন। কোন রোগী তাঁর নিকটে চিকিৎসার জন্যে এলো না। অবশেষে তিনি থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত বড় শহরে আজ পর্যন্ত একজনও রুগী চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এলো না। এর কারণ কি?" প্রতি উত্তরে তাঁকে বলা হয়েছিল, "মুসলিমদেরকে তাদের মহান চিকিৎসক (রসূলুল্লাহ ﷺ) স্বাস্থ্য রক্ষা বিধান স্বরূপ এক নিয়ম-পদ্ধতি বলে গেছেন। যখন থেকে তারা হুযুরের সেই প্রদর্শিত নিয়মে পানাহারাদি অভ্যাস করেছে তখন থেকে সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ শরীরের ব্যাপারে তারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।"

এই তথ্যপূর্ণ বিবৃতি শ্রবণ করে চিকিৎসক মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন এবং মদীনা নগরী ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। সেই সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাও তিনি লাভ করলেন যে, যে জাতি নিজেদের পাকাশয় বা পরিপাক যন্ত্রের প্রতি যত্নদৃষ্টি রেখে চলে সে জাতি কখনও ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। *(রাহবারে কামেল ১৭৭ পৃঃ, ও শেখ সাদীর গুলেস্তাঁ গ্রন্থের বাবে সোম ঃ দর ফযীলতে কানাআত দ্রষ্টব্য)*

ডাক্তার ও হেকীমগণের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, [illegible] অর্থাৎ, "পরহেজ বা পথ্য-অপথ্যের বাছ-বিচার করে চলা ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করা থেকে অনেক গুণে ভাল।" প্রকৃতির এই অটল নিয়ম পালনের প্রশিক্ষণ রোযা বা উপবাসব্রতের মাধ্যমে যতটা লাভ করতে পারা যায় - অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় অতটা

লাভ করা যায় না। রোযার তাৎপর্য্য, রোযার অতুলনীয় ডাক্তারী উপকারিতা বিজ্ঞান ভিত্তিক জিনিষ। এই সবই প্রমাণ করে যে, ইসলামই মানুষের 'স্বভাবধর্ম' অথবা ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত নিয়ম-কানুনের সমষ্টির নাম। ইসলামের মাঝেই এই শক্তি বিদ্যমান রয়েছে যে, সে বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক সুশৃংখল জীবন বিধান উপস্থাপিত করতে সক্ষম যা ধনী-দরিদ্র, সভ্য-অসভ্য, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নির্বিশেষে সকল মানবের জন্য সমানভাবে উপযোগী। এক কথায় ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন-বিধান।

মোটা আটার উপকারিতা

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে নবী করীম ﷺ প্রয়োজন মুহূর্তেও স্বল্পভোজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখানে তিনি আবার একই সঙ্গে রকমারি বিলাসভোজন ও গুরুপাক খাদ্য গ্রাস করা অপেক্ষা সাদা-সিধে খাবারকে উত্তম বলেছেন। হাদীসগ্রন্থে দেখা যায় যে, রসূলে করীম ﷺ গম ও যবের ঐ আটা বেশী পছন্দ করতেন - যা চালুনে চালা হতো না; বরং তাতে গম ও যবের মোটা খোসাগুলোও বিদ্যমান থাকত। এই সাদা মোটা আটার উপকারিতা জানার প্রয়োজন বোধ করলে জার্মানী ডাক্তারগণের বক্তব্য শুনুন; তাঁরা লিখেছেন, "গম ও যবের ভুসি (খোসা) অথর্ব বা অর্ধাঙ্গ ব্যাধি হতে দেয় না।" আবার ইউনানী বা গ্রীক ডাক্তারগণ ঐ খোসাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ঔষধরূপে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা দান করেছেন। সর্দি-কাশীতে ওর সিদ্ধজল (জোশান্দা) যেমন উপকারী, তেমনি ওর পালো বা হালুয়া বুক ধড়ফড়ানি (Heart Palpitation) ব্যাধির উপশম করে। ওর সঙ্গে লবণ মিশ্রিত করে প্রলেপ দিলে ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রে আরাম পাওয়া যায়। আটার সঙ্গে মিশিয়ে খেলে মোটেই কোষ্ঠ কব্জ্ হয় না; বরং পায়খানা পরিস্কার হয়। পরিপাক ক্রিয়াকে শক্তিশালী রাখে এবং অন্ত্রের দূষিত রসাদিকে চোষণ করে নেয়।

আটার এই ভুসির উপকারিতার উপর অনুমান করে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা চালিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার সমস্ত ফল-মূল শস্যাদির উপরের ছাল বা খোসা শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। ওতে মনুষ্য শরীরের উপযোগী খাদ্য-প্রাণ (ভিটামিন, প্রোটিন, শর্করা ইত্যাদি) যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ডাক্তার পান্নালাল রায় প্রণীত 'এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা' গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় প্রধান

প্রধান খাদ্যে কোন প্রকার ভিটামিন কি মাত্রায় আছে শীর্ষক নিবন্ধে দেখা যায় যে, গমের মিহি আটা এবং মোটা আটার মধ্যে কত তফাৎ? গমের মিহি আটাতে ভিটামিন 'এ, বি, সি' সামান্য পরিমাণে থাকে এবং মোটা আটাতে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' মিহি আটার মতই সামান্য পরিমাণে থাকে; কিন্তু ভিটামিন 'বি' খুব বেশী পরিমাণে থাকে। এই তথ্য থেকেও নবী ﷺ-এর মোটা আটা পছন্দ করার যৌক্তিকতা বেশ ভালভাবেই বুঝা যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়ম মাফিক পানী পান করার গুরুত্ব

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে আহারের পরে পরেই পানীয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই প্রিয় নবী করীম ﷺ পানি পান করারও একটা ডাক্তারী সম্মত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা দিতে কসূর করেন নি। তিনি বলেছেন, "পানি কখনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করো না; বরং বসে বসে পান করবে এবং এক নিঃশ্বাসে পান না করে অন্ততঃ তিন নিঃশ্বাসে পান করবে।" কি চমৎকার শিক্ষা! দন্ডায়মান অবস্থায় পানাহার করা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার আর বৈঠক অবস্থায় পানাহার করা একটা স্বস্তিকর ও আরামদায়ক ব্যাপার -এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া দন্ডায়মান অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে শরীরিক বৈলক্ষণজনিত অনেক দুর্ঘটনা ঘটারও সম্ভাবনা থাকে। তাই দয়ার নবী হুযুর ﷺ-এর তরফ থেকে ঐ 'নির্দেশ-নামা' এসেছে।

এক নিঃশ্বাসে পানি পান করলে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অথবা বেশী পান করার সম্ভাবনা থাকে। আর ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অর্থাৎ - পানি প্রয়োজনের বেশী পান করা যেমন অহিতকর, তেমনি প্রয়োজন অপেক্ষা কম পান করাও হিতকর নয়। পক্ষান্তরে তিন নিঃশ্বাসে পানীয় পান করলে ঠিক প্রয়োজন মত পান করবার সুযোগ ঘটে এবং এতে পূর্ণ পরিতৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারা যায়।

পানাহার করার সময় পানীয় ও আহার্য্য বস্তু নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে কিম্বা ফুঁক দিতেও নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন; বরং তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, পান করার সময় পানীয়ের বাইরে নিশ্বাস ত্যাগ করবে। শারীর বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই নির্দেশের গুরুত্ব কম নয়। কারণ আমরা জানি যে, যখন মানুষ শ্বাস গ্রহণ করে

তখন বাইরের মুক্ত বায়ু থেকে ঠান্ডা-শীতল শ্বাস (Oxygen) গ্যাস ফুসফুসের সাহায্যে শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; যা প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য অবিচ্ছেদ্য ও অন্যতম সহায়ক। আবার আমরা যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তখন ভিতরের গরম দূষিত (Carbon-Di-Oxide) গ্যাস নির্গত হয়ে থাকে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শরীর ও স্বাস্থ্যের্যর পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু। ঠিক নিয়মিত সময়ের ব্যাবধানে এই গ্যাস শরীর অভ্যন্তর থেকে বের হতে না পারলেই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে পড়ব। অতএব পানাহার করার সময় যদি নিঃশ্বাস বাইরে ত্যাগ না করে পানীয় ও আহার্য্য বস্তুতেই তা ত্যাগ করা হয়, তাহলে শরীরের ঐ আভ্যন্তরীণ দূষিত গ্যাস ওতে মিশে গিয়ে পানীয় ও আহার্য্য বস্তু দূষিত হয়ে পড়ে। অতঃপর এই দূষিত পানী কিম্বা আহার্য্য পানাহার করলে অনিবার্য্যরূপে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এই কারণেই পানীয় ও আহার্য্য বস্তুতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে অথবা ফুঁক দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

নোটঃ শ্বাস গ্রহণের সময় আমাদের শরীর অভ্যন্তরে যে শীতল বায়ু প্রবেশ করে, শরীর বিজ্ঞানীগণ তার পরিমাণ লিখেছেন, ৪২০ মিলিগ্রাম। *('যত খুশী প্রশ্ন করো' ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

প্রতি নিঃশ্বাসে যদি চারশ কুড়ি মিলিগ্রাম বায়ূ সেবন করা ব্যাতিরেকে আমাদের জীবিত থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে সারা জীবনে আমরা কত বায়ু সেবন করে চলেছি? প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র সেই পরম করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর; যাঁর এই অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করে আমরা বেঁচে রয়েছি। এ ছাড়া পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্যাদিও যে কি পরিমাণ আমরা পানাহার করে চলেছি তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করাও সুকঠিন! বলা বাহুল্য, আমাদের যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় আসে, তখন প্রথমতঃ দুনিয়ার সমস্ত পানীয় ও আহার্য্য গলাধঃকরণ করা রহিত হয়ে যায়। তারপর যখনই শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে উপরোক্ত বায়ু সেবন ক্রিয়াও থেমে যায়, তখনই হয় এই নশ্বর দেহের মৃত্যু! এর কোন রক্ষণ ব্যবস্থা নেই; আর কোন চিকিৎসা বিধানও নেই।

সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অল্লাহু আকবার।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে শূকর-মাংস ভক্ষণের অপকারিতা

ইসলামী দৃষ্টিতে শূকর, মৃত পশু, প্রবাহমাণ রক্ত, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র-পশুর মাংস ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ঐ সবের মাংস ভক্ষণে ক্ষতি তো আছেই; সেই সঙ্গে শরীর-স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ঐ সবের ক্ষতি খুব বেশী। বিশেষ করে শূকর-মাংস সম্পর্কিত বিষয়টি একটু আলোচনা করে দেখা যাক।

শূকর মাংস ভক্ষণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বা হারাম হওয়ার ঘোষণা কুরআনে হাকিমে একবার করেই ছেড়ে দেওয়া হয় নি; বরং সূরা বাকারায় (১৭৩নং আয়াতে) একবার, সূরা মায়েদায় (৩নং আয়াতে) একবার, সূরা আনআমে (১৪৫নং আয়াতে) একবার এবং সূরা নাহলে (১১৫নং আয়াতে) একবার মোট চারবার ওর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সূরা আন্‌আমে শূকর মাংস হারাম হওয়ার কারণও আল্লাহ পাক পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। (⇋” [illegible]) অর্থাৎ, অবশ্যই উহা অপবিত্র ও অতি জঘন্য। *(ঐ সূরা ১৪৫ নং আয়াত)*

কুরআনের তফসীরকার (ভাষ্যকার)গণ অনেক কিছু লিখেছেন। তন্মধ্যে ইমাম ইবনে জরীর ত্বাবারী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিশ্রুত তফসীর 'জামেউল বায়ান'-এ বলেছেন-

'শূকরের মাংস সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে যে, তার বহিরাংশ যেমন অপবিত্র ও নোংরা -ভিতরটাও তেমনি কলুষিত, রোগজীবাণু দ্বারা পরিবৃত। তাই তার সমস্তই হারাম; কোন অংশেই ব্যতিক্রম নেই।' *(ঐ ৩ খন্ড ৩৮ পৃঃ)*

এই তফসীরের টীকায় আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরীর 'গায়ায়িবুল কুরআন ওয়া

রাগায়িবুল ফুরকান' (মিসরীয় ছাপা) তফসীর গ্রন্থে শূকর মাংস নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

'পন্ডিত মন্ডলী বলেছেন যে, খাদ্যবস্তু পরিপাক হওয়ার পর উহা আহারকারীর দেহের সারবস্তুতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ যে সব বস্তু আহার করে তার দ্রব্যগত গুণ তার চরিত্র এবং গুণাবলীকে প্রভাবিত করে থাকে। আর লোভ-লোলুপতা, কাপুরুষতা এবং অতি কামুকতা শূকরের মজ্জাগত দোষ। শূকরের মাংস এ জন্যই হারাম করা হয়েছে যে, উহার স্বভাব-প্রকৃতি দ্বারা যেন মানুষ অপপ্রভাবিত না হয়।' *(ঐ ৪৮-পৃষ্ঠার হাশিয়াহ)*

আধুনিক কালের তফসীর 'আল-মানার'-এর ভাষ্যকার শূকর মাংসের নিষিদ্ধতার কারণ বিশ্লেষণ পূর্বক শেষে মন্তব্য করেছেন, 'উহার মাংস ভক্ষণকারীর দেহে এক প্রকার মারাত্মক কৃমি-কীটের সৃষ্টি হয়। বলা হয়ে থাকে যে, শূকর মাংস ভক্ষণ করার ফলে মানুষের ব্যক্তিজীবনে তার আত্মসম্মান ও শালীনতাবোধে অত্যন্ত অপপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।' *(আল-মানার ২ খন্ড ৯৮ পৃঃ)*

এর অপকারিতা সম্পর্কে বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরও দু-একটি বিবৃতি পেশ করে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস পাব- ইনশাআল্লাহ।

বিগত কয়েক শ বছরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হলেন, চীনের টাং বংশের 'সান্‌সি মাও।' তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্যা-স্যাং-লু (স্বাস্থ্যের ইতিকথা)তে লিখেছেন, 'শূকরের মাংস পুরাতন ব্যাধিসমূহ জীবন্ত করে তোলে। বাতরোগ, হাঁপানী রোগ পরিপুষ্ট করে থাকে।'

শুয়েহ, নূন, উই নামক একজন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্ লিখেছেন, 'শূকরের মাংস ভক্ষণ করলে উহা স্মরণশক্তি দুর্বল করে দেয় এবং উহার ফলে মাথার চুল পড়ে যায়।'

ডঃ গ্লেন শেকার্ড ওয়াশিংটন হতে প্রকাশিত 'ওয়াশিংটন পোষ্ট'-এর ১৯৫২ সনের ৩১ শে মে সংখ্যায় এক নিবন্ধে শূকরের মাংস ভক্ষণের বিপদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'আমেরিকা ও ক্যানাডায় প্রতি ষষ্ঠ ব্যক্তির মাংসপেশীতে 'ট্রিকোনোসিস' ব্যাধির জীবাণু বিদ্যমান রয়েছে এবং শূকরের মাংস ভক্ষণের ফলেই তাদের দেহে 'ট্রিচিনা' নামক এক প্রকার কেশবৎ অসংখ্য ক্রিমির দ্বারা উক্ত রোগের উদ্ভব ঘটে। তিনি আরো বলেন, 'শূকর ভক্ষণকারী কোন ব্যক্তিই এই ব্যাধি হতে মুক্ত নয় এবং এই ব্যাধির কোন চিকিৎসাও নেই। জীবাণু ধ্বংসকারী (এন্টি-বায়োটিক্স) ঔষধ

১/২

১/৪০০

কিম্বা ইঞ্জেকশন এই ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ ক্রিমির কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। মানুষের চুলের মত চিকন এই 'ট্রিচিনা' ক্রিমি লম্বায় ইঞ্চি এবং চওড়ায় ইঞ্চি। মানুষের মাংসপেশীতে কুকড়ানো অবস্থায় প্রায় চল্লিস বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। এই সকল কীটের আদি বংশগুলিকে ভক্ষণ করার ১/২ সপ্তাহ পর উহা মানুষের রক্তে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এই সকল ক্রিমি-কীট মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংক্রামিত হয়। উহার ফলে মানব দেহে একই ধরনের আরো পঞ্চাশটি ব্যাধির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। লবণের প্রয়োগ দ্বারা অথবা রান্নায় এই সকল ক্ষুদ্র ক্রিমিকে হত্যা করা যায় না।'

অতএব শূকরের মাংস ভক্ষণ করা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলারই নামান্তর এবং উহার ফলে মানব জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(আরো বিস্তারিত জানতে হলে, চীনা মুসলিম চিন্তাবিদ্ অধ্যাপক ইব্রাহীম টি ওয়াই মা'র দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফল 'Why Muslims abstion from Porks' অথবা ওর অনুবাদ পুস্তক 'মুসলমান কেন শূকর মাংস খায় না?' -দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

যে পানীয় ও খাদ্য সেবন বা ভক্ষণ করলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে; অর্থাৎ- স্বাভাবিক জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় আবোল-তাবোল বকে, শিরঃঘূর্ণন ও শরীর-দেহ টলে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণচয় যাতে প্রকাশ পায় তাকেই আরবী ভাষায় 'খাম্‌র' বলে। ইহাকে কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় হারাম বলে বিঘোষিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য সেবন করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক ক্ষতি তো হয়ই; সেই সঙ্গে শারীরিক ক্ষতি হয় বহুল পরিমাণে। তাই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম হয়েছে। এমন কি হাদীসে বলা হয়েছে, "যার বেশী পরিমাণ সেবনে মাদকতা বা মস্তিষ্ক বিকৃতি আসে - তার অল্প পরিমাণও (যাতে হয়তো মাদকতা আসবে না) হারাম।"

শারীরিক ক্ষতি সম্পর্কে দুনিয়ার অনেক ডাক্তার অনেক গবেষণামূলক ও অভিজ্ঞতাসহ বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। কোন সুস্থ জ্ঞানী মানুষ মদ-মাদকতাকে সমর্থন করতে পারেন নি। আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ জ্ঞানেও যদি দেখি তবে

সুস্পষ্টতঃ জানতে পারব - মাদকদ্রব্য কত ক্ষতিকর বস্তু! মাদকদ্রব্য সেবনে স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত হওয়া, আবোল-তাবোল বকা, মাথা ঘোরা, শরীর টলে পড়া প্রভৃতি লক্ষণগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয়। এইগুলি কি কম বিপদের কথা?

মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন, "মদ ও জুয়োর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পারস্পরিক জীবনে শত্রুতা, রাগ ও ক্রোধ এনে দেয় এবং আল্লাহর যিক্র (স্মরণ) ও নামায থেকে বিরত রাখতে সুযোগ পায়। অতএব তোমরা (ঐ দুটি থেকে) বিরত হয়ে যাও।" *(সূরা মায়েদাহ ৯১ নং আয়াত)*

এই আয়াত দ্বারা মাদকদ্রব্য ও জুয়োর উভয়বিধ ক্ষতি দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক ক্ষতি; অর্থাৎ, নামায থেকে ও আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতি; অর্থাৎ, পারস্পরিক জীবনে শত্রুতা, রাগ-ক্রোধ ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া। আমরা বাস্তব জীবনেও মাদকদ্রব্য ও জুয়োর উপরোক্ত উভয়বিধ ক্ষতি অহরহ চাক্ষুষ দেখে থাকি।

অনেক সময় দেখা গেছে, মদ্যপায়ী ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মা-বোনেরও অবমাননা করে ফেলে অবলীলাক্রমে। অনেক ক্ষেত্রে নিজের শরীরের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়ায় মাতাল ব্যক্তি নিজের দেহকেও ক্ষত-বিক্ষত করে তুলে। এই সমস্ত নানা কারণের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জনীয় হয়েছে। এমন কি ওর থেকে ঔষধ তৈরীও নিষিদ্ধ হয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে দেখা যায় যে, একজন লোক হুযুর ﷺ-কে মাদক তৈরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন। লোকটি পুনরায় বলেছিল, ঔষধের জন্য আমি মাদকদ্রব্য তৈরী করতে ইচ্ছা করছি? এর উত্তরে হুযুর ﷺ বলেছিলেন "উহা ঔষধ নয়; বরং উহা রোগ আনয়নকারী বস্তু।" *(তফসীর মাযহারী, সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)*

উপরে বর্ণিত আয়াতে বেশ ভালভাবে জানা গেছে যে, মাদকদ্রব্য সেবনে আপোষে কলহ, শত্রুভাবাপন্ন ভাব, ক্রোধ ইত্যাদি পরিস্ফুটিত হয়। বলা বাহুল্য, মানুষের এই ক্রোধ ও উদ্বেগ শারীরিক ব্যাধিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'প্রলাপ-কম্পন-উন্মাদ' রোগ (Delirium Trimens) নামে একটি মারাত্মক ব্যাধি আছে। এই ব্যাধি অপরিমিত মদ্যপানের জন্যেই হয়ে থাকে এবং এই রোগের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এ মর্মে প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখেছেন-

"যে মানসিক রোগে বহুকাল যাবৎ অপরিমিত মদ্যপানজনিত প্রলাপ, কম্প, অনিদ্রা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রধানতঃ বিদ্যমান থাকে - তাহারই নাম 'প্রলাপ-কম্পন।' ধীরে ধীরে এই রোগের লক্ষণচয় প্রকাশ পায় - পাকাশয়িক গোলযোগ (যথা, বমনেচ্ছা, অক্ষুধা), অনিদ্রা, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, ঝিমানিসহ উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্নদর্শন, নিদ্রা হতে চমকে উঠা, মুত্ররোধ, চিন্তাশক্তির দৌর্বল্য বা বিশৃংখলা, অবসন্নতা, জিহ্বা শুষ্ক, মোহ বা আপেক্ষ, প্রলাপ ও সর্বাঙ্গীন কম্পন বা খেঁচুনি। কখনও বা হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া স্থগিত হয়ে মৃত্যু ঘটে। *(পারিবারিক চিকিৎসা ৬৮৮ পৃঃ)*

তবে হ্যাঁ, একেবারে নিরুপায়ের ক্ষেত্রে যখন মাদকদ্রব্য ব্যবহার ছাড়া কোন ঔষধ নেই, তখন পারদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শ মুতাবিক পরিমিত মাত্রায় মাদকদ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, নিরুপায় অবস্থায় যখন মৃত পশু ভক্ষণ ছাড়া জীবন ধারণের কোন উপায় নেই, তখন জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন মত মৃত পশুও ভক্ষণ করা যেতে পারে। মাদক থেকে ঔষধ তৈরীর ব্যাপারটিও ঠিক তেমনি। *(ফতহুল বারী ১ম খন্ড ২৭০ পৃঃ)*

তামাকের অপকারিতা

জর্দা, দোক্তা, খইনী ইত্যাদিগুলো তো মাদকদ্রব্যের শামিল। এ ছাড়া বিড়ি, সিগারেটের মাধ্যমে তামাক সেবনের অপকারিতাও খুব মারাত্মক।

ডাক্তার মারুস, ফ্রেডল দীর্ঘ অভিজ্ঞার পর বর্ণনা দান করেছেন এই বলে যে, একটি সিগারেট সেবনে শতকরা আশি ভাগ লোকের রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতির ব্যাতিক্রম ঘটে।

ডাক্তার মারুস, ফ্রেডল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর বর্ণনা দান করেছেন এই বলে যে, "একটি সিগারেট সেবনে শতকরা আশি ভাগ লোকের রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম ঘটে।"

ডাক্তার হার্ভে ডব্লিউ লিখেছেন, "মৃত্যুর সঙ্গে তামাকের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ওর মধ্যে যে বিষাক্ত বস্তু রয়েছে তার নাম 'নিকোটিন।' এই নিকোটিন বিষ মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য সর্বনাশা জিনিষ।"

হেকীম তবারক করীম 'তকমিলী' (সম্পাদক হুস্‌ন ও সিহ্‌হাত পত্রিকা) তামাক সম্পর্কে একটা বিস্তারিত বিবরণ লিখার পর বলেছেন, 'হুকো, বিড়ি, সিগারেট যারা

সেবন করে অথবা আস্ত তামাক পানের সঙ্গে মিশিয়ে যারা ভক্ষণ করে - তামাক তাদের অধিকাংশেরই ক্ষতি করে। শারীরিক শক্তি কমে যায়, স্মৃতিশক্তি বা মেধা ভোঁতা হয়ে যায়। ভ্রম, শিরঃপীড়া, মাথা ঘোরা ও দুঃস্বপ্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক, হার্ট এবং পাকাশয়ের দুর্বলতা রোগেও তাদের অধিকাংশ জনই ভুগে থাকে।'

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানে নিদ্রার গুরুত্ব

শরীর-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন পবিত্র ও শুচি-শুদ্ধ বস্তু পানাহার করার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না; তেমনি নিদ্রা বা ঘুমের গুরুত্বও নেহাৎ কম নয়। এই কারণে কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ বলেছেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিমিত্তে নিদ্রাকে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বস্তু করে দিয়েছি। *(সূরা নাবা)*

সুস্বাস্থ্যের জন্য যেমন পরিমিত পানাহার করা বাঞ্ছনীয়, তেমনি নিদ্রার জন্যেও একটা সীমা রক্ষা করে চলা উচিৎ। তাই হাদীস গ্রন্থে দেখা যায় যে, নবী করীম ﷺ একদিকে যেমন নিদ্রাত্যাগ করে জাগরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অতি নিদ্রার ভূয়সী নিন্দা ব্যক্ত করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র সাহাবী رضي الله عنه সারা রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন আর দিনের বেলায় প্রতিদিন রোযা রাখতেন। এই খবর প্রিয় নবী ﷺ জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। যখন ঐ সাহাবী হুযুর ﷺ এর খিদমতে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি সারারাত জেগে নামায পড় এবং দিনে রোযা রাখো এই খবর কি ঠিক?" উত্তরে সাহাবী বললেন, 'জী হ্যাঁ! আমি ঐ রকমই করে থাকি।' ইহা শ্রবণ করতঃ নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি যখন ঐরকম কাজ করো, তখন তুমি তোমার চক্ষুকে দুর্বল করে দিচ্ছ এবং তোমার শরীরকে তুমি অকেজো করে তুলছ অথচ তোমার উপরে শরীরের হক (দাবী) আছে, তোমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারও হক আছে। অতএব তুমি (অমনটি করো না)। রোযাও রাখো, মাঝে-মধ্যে রোযা রাখা বন্ধও রাখো। রাত্রির কিছু অংশ নামায উদ্দেশ্যে জেগেও কাটাতে চেষ্টা করো এবং কিছু অংশ নিদ্রার দাবী মিটাতেও খরচ করতে দ্বিধা করো না।" *(বুখারী ১৫৪-১৫৫ পৃঃ)*

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা হুযুর ﷺ রাত্রি জাগরণকে পক্ষান্তরে নিষেধই করে দিয়েছেন এবং শারীরিক ক্ষতির কথাও ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে যাতে তিনি অতি নিদ্রার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন যথা ঃ-

হুযুর ﷺ-এর সমীপে একটি লোকের প্রসঙ্গে সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করছিলেন যে, লোকটি সারাটি রাত্রিই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। এমন কি সকাল হয়ে গেলেও ফজরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে উঠে না বা নিদ্রা ত্যাগ করে না। এ কথা শ্রবণ করে নবী ﷺ বলেছিলেন, "ওর কর্ণকুহরে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।" অর্থাৎ, ওর মানসিক গতির উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার হয়েছে। *(বুখারী ১৫৩ পৃঃ)*

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি উষালগ্নে বা প্রথম প্রভাতে উঠে ওযু করতঃ নামায আদায় করে, সে নতুন ও সতেজ মনে এবং পবিত্র ও সুরুচি সম্পন্ন মেজাজসহ সকাল করে। আর যে ব্যক্তি এ রকমটি করে না, সে অশুচি ও অপবিত্র এবং অবসন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে সকাল করে।" অর্থাৎ - প্রথম জনের জন্য হয় সুপ্রভাত এবং অপরজনের জন্য হয় কুপ্রভাত। *(বুখারী ১৫৩ পৃঃ)*

নিদ্রা যে আরামদায়ক বস্তু এবং ইহার একটা পরিমিত সময় থাকা বাঞ্ছনীয় এ কথা কেবল হাদীস-কুরআনের পাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণও তার বাস্তবমুখী সমর্থন জানিয়েছেন। উড়িষ্যার একজন খ্যাতনামা রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক হেকীম মুহাঃ কাযেম সাহেব লিখেছেন-

"শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কোন সময়ই নিজেদের কাজ বন্ধ রাখে না। অবিরাম গতিতে তারা নিজেদের কাজ করে যায়। কিন্তু নিদ্রাকালে তারা বিশ্রাম নেবার একটা সুযোগ প্রাপ্ত হয়, হার্ট (হৃৎপিন্ড) এর স্পন্দন একটু শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, পিত্তের জন্ম কম হয় এবং কিড্নীর (মূত্রযন্ত্রের) কাজও একটু হালকা হয়ে যায়। ফলতঃ নিদ্রাবস্থায় শরীরের বড় বড় যন্ত্রগুলি সকলেই বিশ্রাম নিতে পায়। সত্যি কথা বলতে কি, স্বাভাবিক ও গভীর নিদ্রা হলেই মনুষ্য শরীর একটা নতুন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।'

নিদ্রাকালে শরীরের অঙ্গগুলি শিথিলতা প্রাপ্ত হয় বলেই শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে। এ কথা ডাক্তারগণ যেমন বলেছেন, তেমনি রসূলুল্লাহ ﷺও বলেছেন এঁদের অনেক পূর্বে। এ মর্মে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য, "চক্ষু একটি শক্ত বন্ধন, যখন দুই চক্ষুতে নিদ্রা নেমে আসে তখন বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।" *(মুসনাদে আহমাদ, বুলূগুল মারাম ১৮ পৃঃ*

মিসরীয়) [1]

অর্থাৎ, জাগরণ অবস্থায় চক্ষুই অতন্দ্রপ্রহরীর কাজ করে, শরীরের সব অঙ্গগুলি ওর নিয়ন্ত্রণে শক্তভাবে নিজের নিজের জায়গায় আপন আপন কাজ করে যায়। অতঃপর যখন চক্ষে নিদ্রা আসে তখন শরীরের সকল বন্ধনগুলি ঢিলে হয়ে যায় এবং এই ভাবেই একটা স্বাভাবিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়।

পরিমিত সময়ের নিদ্রা স্বাস্থ্যকর, অপরিমিত নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এ কথা মহা বিজ্ঞানী হুযুরে করীম ﷺ-এর নিকট থেকে যেমন জানা গেছে, তেমনি দুনিয়ার সমস্ত ডাক্তার, হেকীম কবিরাজগণও তা অকপটে স্বীকার করেছেন। ডাক্তারগণ নিদ্রার একটা নির্ঘন্টও পেশ করেছেন। নিম্নে সেই নির্ঘন্ট উদ্ধৃত করা হলো ঃ-

বয়স	নিদ্রার পরিমাণ
১ বছরের শিশুদের জন্য	২০ ঘন্টা
২ বছর থেকে ৪ বছর পর্যন্ত	১৮ ঘন্টা
৪ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত	১০ ঘন্টা
১৩ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত	৮ থেকে ৯ ঘন্টা
২০ বছর থেকে উর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তির জন্য	৬ থেকে ৭ ঘন্টা

(হুস্ন ও সিহহাত ১৯৬৬ পৃঃ)

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে নিদ্রার যে এত বড় একটা ভূমিকা তার সম্পর্কে কিছু নিয়ম-পদ্ধতি দরকার। তাই মহানুভব নবী করীম ﷺ সুনিদ্রার জন্য কিছু নিয়মও শিক্ষা দিয়েছেন। যার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্য। নিম্নে সেই নিয়মগুলির উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ-

১। নিদ্রা যেহেতু একটি আংশিক মৃত্যু, পূর্ণ মৃত্যুর মালিক যেমন মহান আল্লাহ পাক তেমনি নিদ্রাকালের এই আংশিক মৃত্যুর মালিকও একমাত্র তিনি। তাই শয়ন করার সময় নিম্নের দুআ পাঠ করে শয়ন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে ঃ-

[illegible]

(আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু অআহ্‌ইয়া।)

---

[1] এ ব্যাপারে মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করছিলেন তাঁর তরফ থেকে প্রশান্তি দান করার জন্য। *(সূরা আনফাল ১১ আয়াত)*

অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! তোমার পবিত্র নামে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি এবং পরে আবার জীবিত হব।

অতঃপর নিদ্রা থেকে জাগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর একটা বিশেষ দান। তাই নিদ্রা থেকে উঠে নিম্নের দুআ পাঠ করা বিধেয় ঃ-

[illegible]

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা’দা মা আমাতানা অইলাইহিন নুশূর।)

অর্থাৎ, ঐ আল্লাহর সমূদয় প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুণর্জীবন দান করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদেরকে পুনরুত্থিত হতে হবে।

২। বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহে আসবে তখন বিছানা-পত্রগুলি ভালভাবে ঝেড়ে দিবে। কারণ, তার জানা নেই যে, বিছানার নিচে কি লুকিয়ে আছে।”

ধূলো-বালি থাকলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে, আবার সর্প-বিচ্ছু-পিপীলিকা কিম্বা অন্য কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকলেও ঘুমের বিশেষ ক্ষতি হবে। তাই দয়ার নবী ﷺ ঐ নির্দেশনামা দান করেছেন।

৩। উপরোক্ত নির্দেশের পরেই হুযুর ﷺ বলেছেন “অতঃপর তোমরা ডানকাতে শুয়ে পড়বে ও দুআ পড়বে---।” *(তফসীরে মাযহারী, সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য পাতা ২১৮)*

ডানকাতে শয়ন করার উপকারিতা সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, “ডানকাতে শয়ন করলে হজমক্রিয়ার বিশেষ উপকার দর্শে। চিৎভাবে শয়ন করা নিষিদ্ধ। কারণ, এতে মেরুদন্ড বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং এইভাবে শয়ন করলে ভয়-ভীতিমূলক দুঃস্বপ্নেরও বেশী উদ্রেক করে।’ ([2]) *(হুস্ন ও সিহহাত জানুঃ ১৯৬৬ সংখ্যা।)*

গোঁফকাটা ও দাড়ি রাখার ডাক্তারী উপকারিতা

শরীর বিজ্ঞানী হযরত নবী করীম ﷺ গোঁফকে কেটে ছোট করে দিতে বলেছেন

---

(৭) উবুর হয়ে শোওয়াও ভালো নয়। একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তখন সে উবুড় হয়ে শুয়ে ছিল। তিনি নিজ পা দ্বারা তাকে স্পর্শ করে বললেন, “এ ঢঙের শয়নকে আল্লাহ আযযা অজাল্ল পছন্দ করেন না।” (আহমদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে’ ২২৭০ নং)

এবং দাড়ি না কেটে তাকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিতে আদেশ করেছেন। আজ আমরা হয়তো তার উল্টোটাই করছি। অর্থাৎ, গোঁফ না কেটে দাড়ি কাটায় অভ্যস্ত হয়েছি। এতে শরীয়তের লাভ-নোকসানের কথা কি (?) তা আপাতঃ স্থগিত রাখছি। শরীর-স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে লাভ-নোকসান নিয়েই সম্যক আলোচনায় ব্রতী হচ্ছি ঃ-

একটু আগে আলোচনা করেছি যে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করাকালে শরীর-অভ্যন্তর থেকে দূষিত গ্যাস নির্গত হয়। এক্ষণে যদি গোঁফ কাটা না থাকে তবে সেই লম্বা গোঁফে ভিতরের ঐ দূষিত গ্যাস মিশ্রিত হয়ে তা সহজে বিষাক্ত হয়ে উঠে এবং পানাহার করার সময় ঐ বিষাক্ত গোঁফ পানীয় বা খাদ্যবস্তুতে মিশে বিষময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

দাড়ির ব্যাপারে বর্তমান যুগের ডাক্তারগণ স্বীকার করেছেন যে, আসলে এটা প্রকৃতির একটা সুব্যবস্থা - যার দ্বারা দাঁত ও চোয়ালের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ হয়। ফলে দাঁত ও চোয়ালের অনেক কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ওয়াশিংটনের সুবিখ্যাত ডাক্তার এ, মেকডাঁলড নিজের গবেষণার উপর ভিত্তি করে লিখেছেন, "আমি উপরোক্ত তথ্যের সত্যাসত্য-এর অনুসন্ধান মানসে ৩৫ জন মজবুত ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলাম - যাদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছর। প্রথমে তারা দাড়ি রাখত, পরে তারা দাড়ি চেঁছে দিতে আরম্ভ করল। এর পরিণাম এই হল যে, ওদের মধ্যে কেবল ১৪ জন সুস্থ ও নীরোগ থাকল। আর বাকী ২৬ জন সবাই দাঁত ও চোয়ালের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল।" আবার এই ডাক্তারই লিখছেন, "দাড়িওয়ালা মানুষ ফুসফুসের ব্যাধিতে খুব কম আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অভিজ্ঞতায় ইহাও প্রমাণিত হয়েছে যে, লাগাতার দাড়ি কামালে মানুষের আয়ুও কমে যায়।" *(রাহবারে কামেল ১৮০-৮১ পৃঃ)*

মোট কথা এই ধরণের হুযুরের প্রতিটি নির্দেশে ডাক্তারী উপকারিতা নিহিত আছে। তিনি নখ কাটতে, বগলের নীচে ও নাভীর তলদেশের লোম পরিস্কার করতে যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন - এগুলো মানুষের স্বভাবজাত জিনিষ। এই শিক্ষাগুলোতেও অনেক তাৎপর্য্য আছে, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

সুর্মা ব্যবহার করার উপকারিতা

চক্ষুর জ্যোতি সংরক্ষণের জন্য নবী করীম ﷺ সুর্মা ব্যবহার করার উপদেশ দান করেছেন। হাদীসে দেখা যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ প্রত্যহ রাত্রে শয়নকালে সুর্মা ব্যবহার করতেন।

আরবে যোরকা নাম্নী একজন মহিলা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন। এমন কি তিনি নাকি তিন দিনের পথ পর্যন্ত দেখতে পারতেন। ডাক্তারগণ যখন ওঁর দৃষ্টিশক্তির উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন, তখন চক্ষুর কালো শিরা-উপশিরাগুলি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। অতঃপর ভদ্রমহিলাকে তাঁর অস্বাভাবিক চক্ষুজ্যোতির কারণ সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেছিলেন, "আমি খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে বিশেষতঃ খেজুর ও মাখন ভক্ষণ করে থাকি এবং প্রত্যহ নিয়মিতরূপে 'তূরপাহাড়ী সুর্মা' ব্যবহার করে থাকি।" এই বিবৃতি শ্রবণ করে ডাক্তারগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই কারণেই ওঁর চক্ষুর এত তীক্ষ্মদৃষ্টি। *(রাহ্‌বারে কামেল ১৮-১ পৃঃ)*

এই মর্মে হযরত নবী করীম ﷺ-ও বলেছেন, "তোমরা 'ইসমিদ' পাথরের সুর্মা ব্যবহার করো। এতে চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষু-পলকের লোম গজিয়ে উঠে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩৮৩ পৃঃ)*

মাথায় টুপী পরিধান করার তাৎপর্য্য

মস্তকের কেশ সৌন্দর্য্যের বিশেষ একটি উপকরণ। এরও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, কেশের এই সংরক্ষণ উদ্দেশ্যেই মাথায় টুপী ও পাগড়ী পরিধান করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

সভ্যজগতে অঙ্গ-আচ্ছাদনহেতু যেমন প্রত্যেক অঙ্গের জন্য এক একটা বিশেষ পোষাকে পরিধান করা সভ্যতার পরিচায়ক; তেমনি মস্তকের পোষাকহেতু টুপী ও পাগড়ী পরিধান করা যে একটা সভ্যতা ও ভদ্রতার পরিচায়ক - এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? কেবল পোষাক হিসাবেই ওর গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য শেষ নয়; বরং ওতে শারীরিক উপকারিতাও কম নেই। প্রখ্যাত ডাক্তার লিমেক আরথী লিখেছেনঃ-

"বরাবর মস্তককে নগ্ন অবস্থায় রাখলে চুলের বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ, এতে চুলের যে একটা মসৃণতা আছে তা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং বেশ কিছু কাল পরে চুল পড়তে শুরু করে। কিন্তু টুপী পরলে তা হয় না। সংকীর্ণ বা টাইট টুপী

ব্যবহার করাও ঠিক নয়। কারণ, এতেও চুলের ক্ষতি হয়ে থাকে। এই ক্ষতি শেষে মস্তককে কেশ-শূন্য করেও ছাড়ে। বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কসা টুপী ব্যবহারে কানপটির শিরায় চাপ পড়ে। তার ফলে ঠিকমত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া না হওয়ায় ঠিকমত চুলের পুষ্টি সাধন হয় না। অনিবার্য কারণ হিসাবে তখন চুল পড়তে আরম্ভ করে। *(হুসন ও সিহহাত)*

টুপী ও পাগড়ী পরিধান করা যেমন ভদ্রোচিত পোষাক, তেমনি ইসলামের একটা প্রতীকও বটে। অনুসন্ধান নিয়ে জানা গেছে যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের অধিকাংশ মানুষ টুপী, পাগড়ী রুমাল ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের মস্তককে আবৃত করে রাখে; কিন্তু এক বঙ্গদেশীয় মানুষ নিজেদের মস্তককে (তাদের প্রায় সকলে) অনাবৃত রাখতে অভ্যস্ত। এমনকি, এখানকার মুসলিমগণও তাদের প্রতীক হিসাবেও পরিধান করতে দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করেন।

খত্না করার উপকারিতা

প্রিয় নবী করীম ﷺ এ মর্মে বলেছেন যে, পাঁচটি জিনিস প্রাচীনতম সুন্নত বা মানুষের জন্মগত ব্রত। যথাঃ- ১। খত্না করা। ২। নাভীর তলদেশ পরিষ্কারার্থে লৌহ-অস্ত্র (ক্ষুর) ব্যবহার করা। ৩। গোঁফ কাটা। ৪। নখ কাটা। ৫। বগলের কেশগুচ্ছ উৎখাত করা। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ৩৮০পৃঃ)*

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ؓ বলেন যে, 'গোঁফ ও নখ কাটা, বগলের ও নাভীর তলদেশের লোম পরিষ্কার করার জন্য হুযুর ﷺ কর্তৃক একটা উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা চল্লিশ দিনের উর্ধ্বে ঐসব কাজ না নিয়ে যাই।' *(মিশকাত ৩৮০)*

খত্না ইত্যাদি কর্মগুলি প্রাচীন সভ্যতা বা মানুষের জন্মগত ব্রত বলা হয়েছে। এর প্রমাণ 'মুঅত্তার' একটি হাদীসে দৃষ্টিগোচর হয়। সাহাবী সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন যে, সভ্যতার আলোক দিশারী হযরত ইব্রাহীম ؑ সর্ব প্রথম খত্না করা, গোঁফ কাটা ইত্যাদি কর্মগুলি সম্পাদন করেন। *(তফসীর ইবনে কাসীর ১ম খন্ড ১১৬ পৃঃ)*

ইসলামী সভ্যতায় তাই খত্নাদি করা একটা বিশেষ সুন্নত। বরং খত্না করা ইসলামের একটা বিশেষ প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। শুধু প্রতীকই নয় বরং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে ওর গুরুত্ব খুব বেশী। আধুনিক চিকিৎসকগণও উহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

বঙ্গবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মাননীয় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর 'পারিবারিক চিকিৎসা' গ্রন্থে লিঙ্গের দুটি ব্যাধির বর্ণনা ও তার ঔষধের ব্যবস্থা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, খত্না না করা অবস্থায় লিঙ্গের অগ্রভাগে যে বর্ধিত চর্ম থাকে ব্যাধি দুটি ঐ চর্মেই হয়ে থাকে। ব্যাধি দুটির নাম ঃ

১। মুদা (Phimosis) এই রোগে লিঙ্গের অগ্রভাগের ঐ চর্ম স্ফীত ও প্রদাহিত হওয়ার কারণে লিঙ্গের অগ্রভাগ থেকে উপরে উঠে না। ফলে দারুন কষ্ট পেতে হয়।

২। উল্টামুদা (Paraphimosis) এই রোগে ঐ চর্ম স্ফীত ও প্রদাহিত হওয়ায় লিঙ্গের অগ্রভাগে নেমে আসতে পারে না। এটাও কম পীড়াদায়ক ব্যাপার নয়!

মাননীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখেছেন, "লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক অতিশয় স্ফীত ও প্রদাহিত হওয়ায় উহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তাই (প্রমেহ'র) পুঁজ ভাল রকম নির্গত হইতে পারে না এবং ত্বকটিও খোলা বা বন্ধ করা যায় না। ঔষধে উপকার না হইলে অস্ত্র-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক।" *(পারিবারিক চিকিৎসা ৫৯৩পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, শৈশবকালে ঐ চর্মটিকে 'খত্না' আকারে অপসারণ করে দিলে উপরোক্ত ব্যাধি দুটির আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং বয়ঃপ্রাপ্তকালে রোগ কষ্ট কিম্বা রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপাচার-এর যন্ত্রণা ভোগ করতেও হয় না। খত্না করার উপকারিতা এবং না করার অপকারিতা সম্পর্কে চিকিৎসক বিজ্ঞানীগণ ও কোকশাস্ত্রবিদ্গণ আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানেই ক্ষান্ত হতে হলো।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

শরীর ও স্বাস্থ্য নীরোগ রাখতে হলে কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা সাবধানতা অবলম্বন করাও আবশ্যক। এই আবশ্যকতাকে সম্মুখে রেখে সাবধানী নবী ﷺ আমাদেরকে কয়েকটি জিনিষের অপকারিতা থেকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যাচ্ছে ঃ-

কুকুর থেকে সাবধানতা ঃ

এ প্রসঙ্গে হুযুর ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিয়ে দেবে, অথবা পাত্রটি চেঁটে ফেলবে তখন সেই পাত্রটিকে ৭ (সাত) বার ধৌত করে

পবিত্র করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমবারে মাটি দ্বারা মেজে ফেলবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা কুকুরের এঁটো জিনিষকে কেবল অপবিত্রই মনে করি। কিন্তু ডাক্তারী দৃষ্টিতে তা শুধু অপবিত্রই নয়; বরং শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মারাত্মক ক্ষতিকর জিনিষ। সেই জন্য দু-একবার ধৌত করার কথা না বলে সাতবার ধুতে বলা হয়েছে।

“চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, অধিকাংশ কুকুরের অন্ত্রে অসংখ্য ছোট ছোট পোকা (জীবাণু) বাস করে - যার দৈর্ঘ্য ৪ (চার) মিলিমিটার। মলত্যাগ করার সময় তাদের অসংখ্য ডিম্বাণু মলের সঙ্গে নির্গত হয়। ফলে অনেক ডিম্বাণু মল ত্যাগ করার পরে কুকুরের পাছায় গুহ্যদ্বার সংলগ্ন বস্তির লোমে আটকে থেকে যায়। এবারে যখন কুকুর নিজের দেহকে পরিষ্কার করার ইচ্ছা করে, তখন সে নিজের অভ্যাস মত জিহ্বা দ্বারা চেঁটেই পরিষ্কার করে। সুতরাং তার মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ঐ ডিম্বাণুগুলি সহজেই স্থান পেয়ে যায়। অতঃপর যখন এই কুকুর কোন পানীয় বা খাদ্যদ্রব্যে মুখ দেয়, তখন মুখগহ্বরে বসবাসকারী জীবাণু ডিম্বগুলি ঐসব দ্রব্যে লেগে যায়। তারপর যখন কেউ ঐ ডিম্বাণু মিশ্রিত পানীয় বা খাদ্য গলাধঃকরণ করে তখন খুব সহজে জীবাণু ডিম্বগুলি পেটে গিয়ে প্রবেশ করে। অথবা যখন কেউ ঐরকম কুকুরের চুম্বন গ্রহণ করে (যেমন, ফিরিঙ্গীরা ও ফিরিঙ্গীদের অনুসারীরা নিজেদের জঘন্য আচরণ মুতাবেক ঐ রকম চুম্বন গ্রহণ করে থাকে।) তখন কুকুরের ঐ বিষাক্ত ডিম্বগুলি বেশ সহজে পাকাশয়ে প্রবেশ করে যায়। পাকাশয়ে গিয়ে সেই সব ডিম্ব থেকে জীবাণু জন্ম নেয় এবং পাকস্থলীর ঝিল্লিকে ছিদ্র করে দেয়। শেষ পর্যন্ত রক্তবহা নালীতে গিয়ে পৌঁছে যায়। এরপর তার ভয়াবহ পরিণতি হিসাবে মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস নানা রকমের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে উঠে। এই সমস্ত তথ্য ইউরোপের ডাক্তারগণ কর্তৃক তাঁদের দেশে চাক্ষুষ প্রমাণিত হয়েছে।” *(মিরআতুল মাফাতীহ ১ম খন্ড ৫৫১ পৃঃ)*

“এক্ষণে আর একটি বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে যে, সব কুকুরের অন্ত্রে হয়ত ঐ জীবাণু থাকে না। তা সত্বেও দূরদর্শী নবী করীম ﷺ সমস্ত কুকুরের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত দান করেছেন। এর কারণ হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে জীবাণু পরীক্ষা করার (অণুবীক্ষণ) যন্ত্র সবার কাছে সব সময় থাকে না। ফলে আমরা সহজে পরীক্ষা করে জানতেও পারব না যে, কোন্ কুকুরের লালাতে জীবাণু ডিম্ব রয়েছে এবং কোন্ কুকুরের লালাতে নেই। তাই ওর লালার কেবল অপবিত্রতার উপর ভিত্তি করে সব

কুকুরের ক্ষেত্রে একই রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" *(ঐ ১ম খন্ড ১৫২ পৃঃ)*

সাতবার ধৌত করার নির্দেশ ঐ কারণেই দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন অপবিত্রতা এবং জীবাণু-ডিম্ব লেগে থাকার সম্ভাবনা না থাকে। সেই সঙ্গে মাটি দ্বারা মেজে ফেলার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দান করাটাও বিজ্ঞান ভিত্তিক। কারণ, মহান আল্লাহ মাটির মাঝে বিষনাশক শক্তি নিহিত রেখেছেন। ফলে মাটির দ্বারা কুকুরের লালার অপবিত্রতা যেমন দূরীভূত হয়ে যাবে, তেমনি জীবাণু ডিম্বগুলিও সহজে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দূষিত ঘা, ফোঁড়া এবং জখমের উপশম উদ্দেশ্যে নবী ﷺ মাটি ব্যবহার করেছেন। প্রথমে তিনি তাঁর আঙ্গুলের একটু থুথু লাগিয়ে সেই আঙ্গুলটি মাটির উপর রেখে একটু ধূলো-মাটি লাগিয়ে নিতেন। তারপর আক্রান্ত স্থানে নিম্নের দুআ পাঠসহ সেই আঙ্গুলটি ফিরাতেনঃ-

[illegible]

(বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরযিনা ওয়া বি-রীক্বাতে বা'যিনা লিয়ুশফা সাকীমুনা বি-ইযনে রাব্বিনা)। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১৩৪পৃঃ)*

এর থেকেও জানা যাচ্ছে যে, মাটির মাঝে রোগবীজাণু ধ্বংস করবার শক্তি আছে। তাই তো দেখি যে, আজও অনেক ক্ষেত্রে ঘা ও ফোড়ার উপর মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়ার প্রচলন আছে।

এ স্থলে আরো প্রকাশ থাকতে পারে যে, পাগলা কুকুর আরো ভয়ানক সর্ব্বনাশা জিনিষ। পাগলা কুকুরে যদি কাউকে কামড়ে দেয়, তা হলে তার সুচিকিৎসা হচ্ছে ১৪টা ইঞ্জেকশনের একটা কোর্স। ঠিক সময়মত ঐ ইঞ্জেকশন ব্যবহার না করলে অধুনা যুগে প্রায় কুকুরদষ্ট ব্যক্তিকে অচিরেই 'জলাতঙ্ক' ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বেশ ভালোভাবেই ওয়াকেফ ছিলেন। তাই তিনি তার অপকারিতা প্রতিরোধ মানসে পরিষ্কার নির্দেশ দান করেছেন যে, "পাগলা কুকুর যেখানে যে কেহ দেখতে পাবে, সে যেন তাকে সেই

খানেই হত্যা করে দেয়।” (3)

মাছি থেকে সাবধানতা ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ

কুকুর যেমন আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্রাণী, তেমনি মাছিও খুব মারাত্মক প্রাণী। তাই দয়ার নবী ﷺ মাছি সম্পর্কে আমাদেরকে তার রোগবীজাণু কথা জানিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

“যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যাবে, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করবে। কারণ, তার দুটি ডানার মধ্যে একটিতে রোজীবাণু আছে - অপরটিতে রোগমুক্তি আছে। (পানীয় বস্তুতে পড়ে যাওয়া অবস্থায়) মাছি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে ঐ ডানাটি ডুবিয়ে দিয়ে যেটিতে রোগজীবাণু আছে। অতএব সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার পর নিক্ষেপ করা উচিত।” *(আবু দাউদ ২য় খন্ড ১৮৯ পৃঃ)*

নবী করীম ﷺ-এর এই বর্ণনায় পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, মাছির ডানাতে রোগজীবাণু আছে। আর সে তার রোগজীবাণুবিশিষ্ট ডানাটি ডুবিয়ে রেখে এবং রোগমুক্তবিশিষ্ট ডানাটি উপরে উঠিয়ে রেখে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেবার পর নিক্ষেপ করতে। এই ব্যবস্থায় তার রোগ আক্রমণের প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাও পাওয়া যাচ্ছে।

হুযুর ﷺ-এর যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকলেও তিনি আল্লাহর প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিতে মাছির রোগজীবাণু পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দান করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। বর্তমান যুগে মাছিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মত অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আর ওই সব যন্ত্রের সাহায্যে মাছির উপর পরীক্ষা চালিয়ে যা দেখা গেছে, তাতে নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনার সত্যতা ও পূর্ণ সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। এ স্থলে মাছি সম্পর্কে একটা গবেষণার বিবরণ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি।

(X) আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।” (বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

“যে ব্যক্তি শিকার অথবা (মেষ ও ছাগ-পালের) পাহারার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর (বাড়িতে) পালে সে ব্যক্তির সওয়াব হতে প্রত্যহ দুই ক্বীরাত পরিমাণ কম হতে থাকে।” (মালেক, বুখারী ৫৪৮১, মুসলিম ১৫৭৪, তিরমিযী, নাসাঈ)

"জন্মের ১০/১২ দিন পর স্ত্রীমাছি পচা মল, গোবর, আবর্জনা প্রভৃতিতে একবারে এক-দেড় শত ডিম পাড়ে। ৮ হইতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই ডিম হইতে কৃমির ন্যায় একরূপ শ্বেতবর্ণ পোকা জন্মে। ইহারা ঐ সমস্ত পচা মল খাইয়া বর্ধিত হয় এবং উহার মধ্যে কিলিবিলি করিয়া বেড়ায়। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই পচা মল প্রভৃতিতে এই পোকা অসংখ্য দেখিতে পাইবে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে 'শুককীট' বলে। শুককীট অবস্থায় ইহারা ৪/৫ দিন থাকে। পরে ইহাদের দেহ গুটাইয়া যায় এবং ইহারা গুটির আকার ধারণ করে। তখন ইহাদেরকে 'মূককীট' বলে। এই অবস্থায় ইহারা ৪/৫ দিন থাকে। অবশেষে মূককীটের দেহ বিদীর্ণ করিয়া মাছি বহির্গত হয়। মাছি দেড় মাস হইতে চারিমাস পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। ইহারা ২৪ ঘন্টায় ৫০ বার মলত্যাগ করে এবং ঘন-ঘন বমি করে।"

"কলেরা, রক্তামাশয়, টায়ফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত লোকের মল, বমি, থুথু, কাশি প্রভৃতিতে মাছি বসে। এই সমস্ত রোগের জীবাণু মাছির পায়ে এবং গায়ে লাগিয়া যায়। পরে ইহারা যখন আমাদের খাদ্য-দ্রব্যে আসিয়া বসে, তখন উহাদের শরীর হইতে এই সমস্ত রোগের জীবাণু খাদ্য-দ্রব্যে লাগিয়া যায়।" *(ডাঃ বিশ্বেশ্বর চট্টোঃ প্রণীত 'শরীর রক্ষণ' ১০১-১০৩ পৃঃ)*

ডাক্তার পি,বি, আইজেক লিখেছেন, "মাছি মানুষের সাংঘাতিক শত্রু। বিজ্ঞান-সম্মত অভিজ্ঞতায় এবং সাধারণ দর্শনেও জানা গেছে যে, মাছির জন্মের হার বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে মানুষের নানা রকম ব্যাধির প্রসারের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মাছি মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যে একটা ভয়ানক বিপদ-জনক জিনিষ। কারণ, সে রোগের জীবাণু পরিবহন করে বেড়ায় এবং মানুষ ও গবাদি পশুর মাঝে রকমারি রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক একটি মাছির দেহে ৮০০,০০০ থেকে ৫০০০,০০০ পর্যন্ত রোগ-জীবাণু বিদ্যমান থাকে। আর সে তার অন্ত্রে ১০,০০০ থেকে ২৩০,০০০ পর্যন্ত বিষাক্ত জীবাণু নিয়ে উড়ে বেড়ায়।' *(হুসন ও সিহহাত)*

উপরোক্ত বিবরণ থেকে নবী করীম ﷺ-এর মাছি সম্পর্কে উক্তি যে বিজ্ঞান ভিত্তিক - তা সহজেই বুঝা গেল। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁর কোন কথাটাই কল্পনা ভিত্তিক ও অবাস্তবিক নয়। অতএব তাঁর প্রতিটি বাণীকে নিজেদের বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে আমাদের ধন্য হওয়া উচিত এবং বার বার তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম (শান্তিধারা) বর্ষণ করাও উচিত। আল্লাহুম্মা সল্লে আলাইহি ওয়া সাল্লিম।

যেখানে সেখানে থুথু ফেলা নিষিদ্ধ

যেখানে সেখানে থুথু ফেলা যেমন আজকের সভ্য-জগতে ও চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে নিষিদ্ধ, তেমনি আলোক দিশারী নবী করীম ﷺ-ও তার খুব নিন্দা করে গেছেন।

একদা মসজিদের সম্মুখভাগে হুযুর ﷺ কফ বা শ্লেষ্মা দেখা মাত্র মসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তিদের উপর খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "তোমরা যখন নামায পড়ার অবস্থায় থাকো, তখন তোমাদের সম্মুখে মহান আল্লাহ বিদ্যমান থাকেন। অতএব খবরদার! কেউ এইভাবে থুথু বা কফ নিক্ষেপ করবে না।"

অতঃপর হুযুর ﷺ নিজ হাতে ওটিকে রগড়ে পরিষ্কার করেছিলেন। *(বুখারী ১/১৬২)*

এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, যেখানে সেখানে থুথু, কফ নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় আচরণ।

মল-মূত্র ত্যাগ করার নিয়ম পালন

সুস্বাস্থ্য রক্ষা উদ্দেশ্যে পুষ্টিকর, লঘুপাক খাদ্য ও পানীয় নিয়মিত পদ্ধতিতে পানাহার করা যেমন বাঞ্ছনীয় তেমনি ভুক্তদ্রব্যগুলি পরিপাক যন্ত্রে হজম হওয়ার পর অসার ও অকেজো পদার্থগুলি মল-মূত্রের পথ দিয়ে নির্গত হওয়াও জরুরী। এগুলি পেটে জমে থাকলে স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। ক্ষুধামন্দ, অজীর্ণ, রক্তদোষ, মাথাভারবোধ, শরীর নিস্তেজ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাই যাতে মল-মূত্র পরিষ্কার ভাবে হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা খুবই উচিত। বলা বাহুল্য যে, এই কারণেই নবী ﷺ পায়খানা ও প্রস্রাবের কিছু নিয়ম-পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে কসুর করেন নি। যে বিধি-নিষেধগুলি মেনে চললে একাধারে আমরা যেমন ধর্মের দিক দিয়ে উপকৃত হতে পারব, তেমনি আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক দিয়েও প্রচুর লাভবান হতে পারব।

এ প্রসঙ্গে অনেক শিক্ষামূলক কথা আছে। তন্মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে নির্জনতা অবলম্বন করা। যদি বাড়ীর পার্শ্বে কোন একটি জায়গায় টাট্টি বা দেওয়াল বেষ্টন করতঃ ঘিরে দেওয়া যায় তবে ইহা খুব ভাল। অন্যথায় মাঠে-ময়দানে এমন জায়গায় গমন করতে হবে যেখানে কারো দৃষ্টিপাত হবে না।

জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত 'রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মলত্যাগ করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি এত দূর পর্যন্ত হাঁটতেন - যেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পেত না।' *(আবূ দাউদ, মিরআত ১ম খন্ড ৪১৮ পৃঃ)*

পরবর্তীকালে 'পায়খানা ঘর' নির্মিত হলে হুযুর ﷺ পায়খানা ঘরেই পায়খানা করতেন। এরও অনেক প্রমাণ রয়েছে।

এই নির্জনতা অবলম্বন বা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে মল-মূত্র ত্যাগ করার উপকারিতা খুবই প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ লজ্জাবোধ, দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিকভাবে পায়খানা করার সুযোগ লাভ। লোক সমাগমের জায়গায় পায়খানা ফিরতে বসলে হঠাৎ মানুষের আবির্ভাব ঘটলে সহসা লজ্জা পেয়ে তাকে উঠে পড়তে হয়। এর ফলে তখন তার মলত্যাগ করার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। আর এই গতি রুদ্ধ হওয়া শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর ব্যাপার।

"একদা একজন দেহাতী (বেদুঈন) মসজিদে নববীতে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। ইহা দর্শন করতঃ সাহাবীগণ তাকে গাল-মন্দ দিয়ে বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। প্রিয় নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন যে, "ওকে ছেড়ে দাও (বাধা দিও না, পেশাব করতে দাও)। আর ওর পেশাবের জায়গায় পূর্ণ এক ডোল (বালতি) পানি বহে পবিত্র করে দাও। শুনো! তোমরা মানুষের প্রতি সহজ ও নম্র ব্যবহারকারীরূপে প্রেরিত হয়েছ; শক্ত ও কড়া ব্যবহারকারীরূপে প্রেরিত হও নি।" *(বুখারী, মিরআত ১ম খন্ড ৫৫৪ পৃঃ)*

দেহাতী লোকটি সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত। তাই তার নির্লজ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করার সাহস হয়েছিল। এই অজ্ঞ, মূর্খ লোকটিকে যদি সাহাবীগণ গাল-মন্দ দিয়ে পেশাব করতে বাধা দিতেন, তাহলে সহসা মূত্ররোধ হয়ে তার শারীরিক ক্ষতি হতো! তাই দয়ার নবী তাকে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মল-মূত্রের বেগ চেপে রাখা উচিত নয়। যখনই মল-মূত্রের বেগ অনুভব হবে, তখনই মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত। মল-মূত্রের বেগ চেপে রাখলে তার স্বাভাবিক গতি রোধ করা হয়। আর স্বাভাবিক গতি রোধ করলেই শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

আযান হয়ে গেলে প্রত্যেক মুসলিমকে (যাদের উপর নামায ফরয) জামাতের সঙ্গে নামায পড়া অপরিহার্য কর্তব্য। জামাআত শুরু হয়ে গেলে কোন কাজ-কর্ম করা চলে না। এমনকি নফল-সুন্নতাদি নামায পড়াও চলে না; ঐ সমস্ত নামায ছেড়ে জামাআতে শরীক হতে হয়। কিন্তু যদি কারো মল-মূত্রের বেগ থাকে তবে সে মল-মূত্র ত্যাগ করেই নামাযে শরীক হবে। এতে যদি তার জামাআত ছুটে যায় তাতেও কোন দোষ নেই।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আরকাম ﷺ বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলতে শুনেছি, "যখন নামায দাঁড়িয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ মল-মূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, তখন সে যেন (নামাযে শামিল হবার পূর্বে) মল-মূত্র ত্যাগ করে নেয়।" *(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিরআত ২য় খন্ড ৭৬পৃঃ)*

মল-মূত্রের বেগ চেপে নামাযে শামিল হলে সুস্থির ও শান্ত-শিষ্ট মনে নামায আদায় হবে না এবং সেই সঙ্গে মল-মূত্র রোধ করা হেতু শরীর-স্বাস্থ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়াও ভোগ করতে হবে - তাই ঐ নির্দেশনামা এসেছে।

তৃতীয় কথা হচ্ছে যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করা অনুচিত; যেমন, পুকুর বা জলাশয়ের আবদ্ধ পানিতে অথবা পুকুর বা নদীর ঘাটে কিম্বা গোসলখানা, মধ্যরাস্তা বা ছায়া অচ্ছাদিত জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ হয়েছে।

নবী ﷺ বলেছেন, "খবরদার তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে (যে পানি প্রবাহিত হয় না) কখনই পেশাব না করে। কারণ, ওই পানিতে পেশাব করে আবার ওতেই তোমাকে গোসল করতে হবে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিরআত ১ম খন্ড ৫৩২ পৃঃ)*

অতএব কোন পুকুরে অথবা জলাশয়ে পেশাব করা খুবই নিন্দনীয় আচরণ। আমাদের কোন কোন মেয়েছেলের অভ্যাসই আছে পুকুরের ঘাটে বসে পেশাব করার। আবার অনেক গ্রামের মসজিদের পেশাবখানার নল সরাসরি পুকুরে গিয়ে পৌঁছেছে। এগুলি জঘন্য ব্যাপার। একটি পুকুরে সারা বছরে প্রতিদিন একটু একটু করে পেশাব জমতে থাকলে কত পেশাব জমবে? সেই পুকুরের পানি সম্পর্কে আপনি ধর্মীয় পন্ডিতরূপেই বা কি ফতোয়া প্রদান করবেন? এবং একজন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরূপেই বা কি মীমাংসা দেবেন।

আবূ-দাউদ শরীফের একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপের কাজ থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ, (১) পুকুর বা নদীর ঘাটে, অথবা (২) মানুষের চলাচল পথের মধ্যখানে, কিম্বা (৩) ছায়াময় স্থানে পায়খানা পেশাব করা।" *(মিরআত ১ম খন্ড ৪২৩ পৃঃ)*

উপরোক্ত তিনটি জায়গায় পেশাব করলে জায়গাগুলি নোংরা হয় এবং সেগুলির আবহাওয়াও দূষিত হয়ে উঠে। মল-মূত্রের নোংরা পদার্থেই নানা রকমের রোগ জীবাণু সৃষ্টি হয় এবং ওর থেকে রোগও সংক্রামিত হয়। অতএব এই প্রকার জঘন্য আচরণকারী ব্যক্তির প্রতিটি দর্শকের পক্ষ হতে গালি-গালাজ এবং অভিসম্পাত বর্ষণ হওয়া খুব স্বাভাবিক কথা। তাই সাবধানী নবী ﷺ ঐ রকম অভিশাপপূর্ণ

আচরণ থেকে মানুষকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

উম্মতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নবী করীম ﷺ এই ধরনের কত মূল্যবান বাণী যে রেখে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সত্যিই তিনি আমাদের দয়ালু ও অগাধ করুণাময় নবী ছিলেন। তিনি নিজে তাঁর পবিত্র মুখে বলেছেন,

[illegible] .

অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য সন্তানদের প্রতি পিতার মত (দয়ালু ও শুভাকাংখী)। *(ইবনে মাজাহ, মিরআত ১ম খন্ড ৪২০ পৃঃ)*

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহি ওয়া সাল্লিম।

ইসলামের দৃষ্টিতে

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

❁❁❁❁

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিকিৎসা বিজ্ঞান

ইসলামের চিকিৎসা বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ঃ শারীরিক, দ্বিতীয় ঃ মানসিক বা আধ্যাত্মিক।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিরাময় হেতু শরীরের প্রতি যে চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্দেশিত হয় তাকে শারীরিক চিকিৎসা বলে এবং যে সব কর্ম ও চিন্তা মানুষকে ধর্মীয় আসন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সেই সব কর্ম ও চিন্তার নিরসন কল্পে চিন্তাশক্তির উপর যে চিকিৎসা করা হয় তাকে মানসিক বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বলে।

নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাহেতু যেমন বহুবিধি আদেশ-নিষেধ দান করেছেন, তেমনি তিনি শারীরিক চিকিৎসা বিধানকল্পেও সময়োপযোগী যে ব্যবস্থাপত্র দান করেছেন তার মূল্য ও গুরুত্ব খুব বেশী; আর শারীরিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সে তুলনায় কম হলেও তা নেহাৎ কম নয়। এক্ষণে তাই সেই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে সম্যক আলোচনা করার প্রয়াস

পাব। 'অমা তাওফী-কী ইল্লা বিল্লাহ।'

পাকাশয় সম্পর্কে মন্তব্য

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পাকাশয় হচ্ছে - শরীরের জন্য 'জলাশয়' তুল্য। আর শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি জলাশয়ে অবতরণকারী প্রাণী সমতুল্য। অতএব যখন পাকস্থলী সুস্থ থাকে তখন শিরা-উপশিরাগুলি সুস্বাস্থ্যদায়ক রস সেবন করে প্রত্যাগমন করে। আর যখন তা অসুস্থ থাকে তখন শিরা-উপশিরাগুলি স্বাস্থ্যহানির রস চোষণ করে ফিরে যায়। *(ত্বাবারানী, বায়হাকী, মযাহেরে হক ৪র্থ খন্ড ৩৮ পৃঃ)* ([4])

উপরোক্ত বর্ণনায় নবী করীম ﷺ-এর শরীর তত্ত্ববিদ্যা বা 'এ্যানাটমি' সম্পর্কে কতটুকু পারদর্শিতা ছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারা যাচ্ছে। হুযুর ﷺ-এর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে আমরা জানতে পারছি যে, পাকাশয়ের সঙ্গে শরীরের শিরা -উপশিরাগুলির বেশ একটা যোগসূত্র আছে। আমরা যা কিছু পানাহার করি তার সার বস্তুটুকু পাকাশয় থেকে শিরা-উপশিরাগুলি চোষণ করে রক্তাকারে রূপান্তরিত করতঃ সারাদেহে প্রসারিত করে দেয়। সুস্বাস্থ্য অথবা স্বাস্থ্যহানি নির্ভর করছে পাকাশয়ের সুস্থতা অথবা অসুস্থতার উপর। পাকাশয় সুস্থ থাকলে ভুক্তদ্রব্যের সার পদার্থ যথার্থরূপে শরীরে পৌঁছে এবং স্বাস্থ্য-শক্তি অটুট ও অক্ষুন্ন থাকে। পক্ষান্তরে পাকাশয় অসুস্থ থাকলে ভুক্তদ্রব্যের সারপদার্থ যথাযথরূপে তৈরীও হতে পারে না এবং তা ঠিকমত শরীরেও পৌঁছে না। ফলে এ রকম ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণরূপেই তখন স্বাস্থ্যহানির শিকার হয়ে পড়তে হয়।

আধুনিক কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণও উপরোক্ত মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করেছেন। এঁদের বই-পুস্তকগুলি পড়া-শুনা করে জানা গেছে যে, ভুক্তদ্রব্যসমূহকে পরিপাক বা হজম করানোর জন্য পাকাশয় গ্রন্থিসমূহ হতে এক প্রকার রস নিসৃত হয়। ঐ রসকে গ্যাষ্ট্রিক-যুস বা পাকাশয়িক রস বলে। পেপ্সিন ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড নামক পাকাশয় রস টক বা অম্লস্বভাবপূর্ণ। ইহা খাদ্যের আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় পদার্থসমূহকে পরিপাক করতে সহায়তা করে।

এক্ষণে যদি পাকাশয় ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে হজমক্রিয়ার জন্য যে পরিপাক

([4]) হাদীসটি মুনকার; সহীহ নয়। সিলসিলাতুল আহাদীসুয যায়ীফাহ ১৬৯২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

রস নিঃসৃত হওয়া দরকার তা ঠিক মত নিঃসৃত হবে না। ফলে তখন বদহজম রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আর যখনই ভুক্তদ্রব্য ঠিক মত হজম হবে না, তখন শরীর পুষ্টিকর রস থেকে বঞ্চিত হবে এবং স্বাস্থ্যহানির শিকারে পরিণত হবে।

নবী করীম ﷺ এর উপরোক্ত বাণীর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রাখতে হলে পরিপাক যন্ত্রের প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। আমাদের পাকস্থলীতে যাতে লঘুপাক, পুষ্টিকর ও পবিত্র আহার্য্য নিক্ষিপ্ত হয় - সেটাই হচ্ছে আকর্ষণীয় ও লক্ষণীয় বিষয়। লঘুপাক, পুষ্টিকর ও পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করলেই পাকাশয় সুস্থ থাকবে। পক্ষান্তরে গুরুপাক, অপুষ্টিকর ও অপবিত্র আহার গ্রাস করলে নিঃসন্দেহে পাকাশয় অসুস্থ হয়ে পড়বে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ ও নীরোগ রাখা। বলা বাহুল্য, এই মূল লক্ষণীয় বিষয়টির সিদ্ধিলাভ নির্ভর করছে - পাকাশয় সম্পর্কে উপরোক্ত অমীয় বাণীর মর্মানুসারে পানাহার করা। অতএব আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, পাকাশয় সম্পর্কে হুযুরের মন্তব্য, এক অভিনব ও অমূল্য মন্তব্য।

ঔষধ সম্পর্কে মন্তব্য

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যাধির জন্যে ঔষধ আছে। যখন ঔষধ ঠিক অনুকূলে নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়, তখন মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সে ব্যাধি সেরে যায়।" *(মুসলিম শরীফ, মিশকাত ৩৮৭পৃঃ)*

স্বাস্থ্যের সংরক্ষণহেতু ও রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ ব্যাপার নয়; কিম্বা 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা) বিরোধীও নয়। যেমন, ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণ উদ্দেশ্যে পানাহার করা 'তাওয়াক্কুল' বিরোধী ব্যাপার নয়। তবে এখানে দুটি জিনিষ বিচার্য্য ও লক্ষণীয় বিষয়ঃ-

১- রোগ অনুপাতে ঔষধ নির্বাচন ও তা ঠিকমত ব্যবহৃত হতে হবে। কারণ রোগ অনুপাতে ঔষধ সুনির্বাচিত না হলে গাড়ী গাড়ী ঔষধ সেবন করলেও কোন লাভ পাওয়া যাবে না এবং ঠিকমত ঔষধ ব্যবহার না করলেও রোগের উপশম হবে না।

২- সুনির্বাচিত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রোগমুক্তিদাতা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সহযোগিতা হওয়া দরকার। কারণ, একথা খুবই সত্য যে, প্রকৃত আরোগ্যদাতা

মহান আল্লাহ। আর ঔষধ কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কুরআনে হাকীমে এই মর্ম কথাটিই বলা হয়েছে ঃ-

(([illegible]))

অর্থাৎ, আমি যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। *(সূরা শুআরা ৫ম রুকু)*

বহু ক্ষেত্রে এমনও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়েছে এবং ঔষধও যথারীতি সুনির্বাচিত ও ব্যবস্থিত হয়েছে; কিন্তু তবুও কোন শুভ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না বা রোগের কোন উপশম পরিদৃষ্ট হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর বাণী যথার্থ বলে স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই। অর্থাৎ, ঐ সকল রুগীর ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঔষধের সঙ্গে প্রকৃত আরোগ্যদাতা আল্লাহর ইচ্ছা সহযোগিতা হয় না বলে এমনতর হয়।

চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, "তিন রকম প্রণালীতে রোগ নিরাময় হতে পারে। প্রথমতঃ- অপারেশন অস্ত্র (সিঙ্গী) ব্যবহার পদ্ধতি, দ্বিতীয়তঃ- মধুপান প্রণালী, তৃতীয়তঃ- অগ্নিদ্বারা দাগ দেওয়া প্রক্রিয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে (শেষোক্ত) দাগ দেওয়া পদ্ধতি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করছি।" *(বুখারী, মিশকাত ৩৮৭ পৃঃ)*

এই নির্দেশনামায় যাবতীয় রোগের একটা মোটামুটি চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। মনুষ্য শরীরে রোগের উৎপত্তি হয় - সাধারণতঃ তিনটি কারণে, শোণিত (রক্ত) দোষ, কফদোষ ও পিত্তদোষ। এই ত্রিদোষই হচ্ছে রোগ উৎপত্তির মুখ্য কারণ। যদি কারো রক্তদোষ জনিত ব্যাধি সংক্রামিত হয় তবে তার চিকিৎসা করতে হলে শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করার একটা উত্তম প্রক্রিয়া অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, অপারেশন; অস্ত্র (তীক্ষ্ণ ছুরি, নরুন ইত্যাদি) দ্বারা আক্রান্ত স্থানে একটু পেঁচে দিয়ে সিঙ্গী দ্বারা বদ রক্ত টেনে ফেলা। শেষোক্ত দুই কারণে অর্থাৎ, কফ ও পিত্তজনিত ব্যাধিসমূহে 'জুলাপ' ব্যবস্থা খুব উপযোগী ব্যবস্থা। যাতে কোরে কফ ও পিত্তের নিঃসরণ সহজ উপায়ে করা যেতে পারে। বলা-বাহুল্য, মৃদু-মন্দ জুলাপরূপে নবী করীম ﷺ মধুপান করার কথা নির্দেশ করেছেন। মধু কফ নিঃসারণ ও পিত্ত নিঃসারকরূপে কাজ করে বলেই ভেষজবিদ নবী ﷺ ঐ

ব্যবস্থা নিরুপণ করেছেন। আবার কিছু দূষিত পদার্থ শরীরে এমনভাবে জমে বসে থাকে যে, তাকে অন্য কোন প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা সম্ভব হয় না। তখন সেই রকম ক্ষেত্রে অগ্নি সংযোগে দাগ বা সেঁক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে "আখেরুদ্ দাওয়ায়ে আল-কাইয়ো।" অর্থাৎ, সর্বশেষ ঔষধ হচ্ছে অগ্নিদ্বারা দাগ দেওয়া। তবে এ পদ্ধতি খুব কষ্টদায়ক এবং এর অপপ্রয়োগ হলে ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। তাই দয়ার নবী ওর প্রয়োগবিধিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

আজকাল আধুনিক ব্যবস্থা রূপে অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ দ্বারা 'শক' লাগানো পদ্ধতি। অতএব যদি বলি যে, নবীযুগের অগ্নি সংযোগে দাগ দেওয়া প্রক্রিয়ার বিকল্প আধুনিক ব্যবস্থা 'শক লাগানো পদ্ধতি' (Shock treatment) তবে ইহা খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

এ মর্মে ডাঃ কিরণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখেছেন, "ইলেকট্রিক কারেন্ট যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুর (Nerve) উপর চালাইয়া বেশ ফল পাওয়া যায়। স্নায়ুর উপর কারেন্ট লাগাইলে রক্তের চলাচল বৃদ্ধি হয়। 'নিউরালজিয়া' হইলে ক্যাপিলারী সার্কুলেশন কম হয়। সুতরাং ইলেকট্রিক কারেন্ট যখন সার্কুলেশন (রক্তের গতি) বৃদ্ধি করে তখন ইহা ব্যবহার করিলে নিউরালজিয়ার যন্ত্রণা আরোগ্য হইবে - সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

Professor Recwal of New yark নিউরালজিয়া রোগে ইলেকট্রিক কারেন্ট সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি বলেন, "যে স্থলে স্নায়ুর উপর চাপ দিলে রোগী অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিবে - সে স্থলে 'গ্যালভানিক' কারেন্ট প্রয়োগ করিতে হইবে। আর যে স্থলে স্নায়ুর উপর চাপ দিলে রোগী আরাম অনুভব করে - সে স্থলে ফ্যারাডিক কারেন্ট প্রযোজ্য।' *(এলোপ্যাথিক প্রাক্টিশনার ৬৬৬ পৃঃ)*

ভেষজতত্ব বা দ্রব্যগুণ

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীকে রঙ-বেরঙের ফল-ফুল, রকমারি গাছ-গাছড়া ইত্যাদি দিয়ে কেবল সুসজ্জিতই করেন নি; বরং এসবগুলোতে মানুসের শরীর-স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখার উপকরণ এবং রোগ নিরাময়ের গুণাবলীও নিহিত রেখেছেন। ডাক্তারী,

হেকিমী ও কবিরাজী মতে তৈরী যাবতীয় ঔষধ-পথ্য ঐ সমস্ত গাছ-গাছড়া ও ফল-মূলাদি থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। যার থেকে যুগে যুগে মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাময়ের কাজ পেয়ে আসছে।

গাছ-গাছড়া, ফুল-মূলগুলি যেমন বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি ও রকমারি স্বাদের হয়, তেমনি তাদে ভেষজগত গুণাবলীও রকমারি ধরণের হয়ে থাকে। সেগুলি ঠিকমত নির্ণয় ও নিরুপণ করাই হচ্ছে ডাক্তার কবিরাজদের বিশেষ কৃতিত্ব। মহানবী হযরত রসূলে করীম ﷺ এ প্রসঙ্গেও যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। নিম্নে তাঁর সেই ভেষজতত্ব বা দ্রব্যগুণ সম্পর্কে মন্তব্যের কিছু উদাহরণ পেশ করা সমীচীন মনে করছি।

মধুর ভেষজগত গুণাবলী

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনদিন সকালে মধু চেঁটে খাবে, সে কোন বড় রকমের ব্যাধি-কষ্টে পতিত হবে না।"

কুরআনে হাকীমে মহান আল্লাহ বলেছেন, (([illegible]))

অর্থাৎ, উহাতে (মধুতে) মানুষের নিমিত্তে রোগমুক্তি বিদ্যমান আছে।

সত্যিই মধু একটা মূল্যবান ও বহু দোষনাশক ভেষজ - এতে কোন সন্দেহ নেই। 'সিফরুস সাআদাহ' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, "নবী করীম ﷺ প্রত্যহ একটি পিয়ালাতে পানি মিশিয়ে মধু পান করতেন।" মধু বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মধু পানিতে মিশ্রিত করে পান করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এত ফলপ্রসূ যে, তা একমাত্র মধু সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিগণই জানেন।

ভেষজ বিজ্ঞানীগণ এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, মধু একটা বহুবিধ মঙ্গলদায়ক সম্পদ।

বিশ্বখ্যাত হেকীম 'জালীনুস'-এর মন্তব্য, 'ঠান্ডাজনিত ব্যাধিতে মধুর তুল্য ঔষধ নেই।'

ইউনানী ডাক্তারগণ লিখেছেন, সকাল বেলায় খালি পেটে পরিমাণ মত মধু পান করা বা চেঁটে খাওয়া খুবই উপকারী; এতে কফ নির্গত হয়। পেটের বদ্ধ ময়লা বা দূষিত বস্তুগুলি দূরীভূত হয়ে যায় এবং পাকস্থলীর যথাযথ ক্রিয়া ঠিক রেখে অগ্নিবৃদ্ধি

করে। এ ছাড়া পেটের জমা বায়ু নির্গত করতেও সাহায্য করে। মেয়েদের মাসিক স্রাব, বুকের দুধ এবং প্রস্রাবধারা প্রবাহিত রাখতেও এর কাজ যথেষ্ট। এমনকি মূত্রপাথুরি ও পিত্তপাথুরিগুলিকে গলিয়ে বের করে দেয়। *(মযাহেরে হক ৪র্থ খন্ড ৪২পৃঃ)*

মধু সম্পর্কে একটা ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, 'আমার ভায়ের উদরাময় (পাতলা দাস্ত) হয়েছে।' হুযুর ﷺ বললেন, "ওকে মধু পান করাও।"

নির্দেশ পেয়ে তাকে মধু পান করানো হলো। কিন্তু উদরাময় উপশম হলো না। হুযুর ﷺ পুনরায় মধুপান করাতে বললেন। এইভাবে পর পর তিনবার নির্দেশ দিলেন। ৪র্থ বারে লোকটি এসে বলল, 'ওকে প্রত্যেকবারই মধু পান করানো হয়েছে; কিন্তু তবুও কোন উপশম হয় নি; বরং উদরাময় আরো বৃদ্ধিই পেয়েছে।'

ইহা শ্রবণ করে হুযুর ﷺ বললেন, "মহান আল্লাহর বাণী সত্য, তোমার ভায়ের পেটই মিথ্যা।"

এর পরে লোকটিকে আর একবার মধু পান করানো হলো এবং সম্পূর্ণ সেরে উঠল। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৩৮৭)*

নবী করীম ﷺ ব্যবস্থাপত্র দান করতে কত স্থিরসিদ্ধান্ত ছিলেন তা উপরোক্ত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। বারংবার অসুখ না সারা অভিযোগ সত্ত্বেও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি। কারণ, মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যে বাণীতে বলা হয়েছে "মধুতে মানুষের রোগমুক্তি আছে।" অথবা ঐ রোগীটির ব্যাপারে হুযুর ﷺ মধু পান করানোর জন্য অহী (প্রত্যাদেশ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁর ব্যবস্থাপত্র দানে অতটা অটলতা লক্ষ্য করা গেছে।

"তোমার ভায়ের পেট মিথ্যা" -এ কথার অর্থ, ঔষধ ঠিক ক্রিয়া করবে; কিন্তু তোমার ভায়ের পেট সে ক্রিয়া গ্রহণ করছে না। অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ পেটে জমে আছে। এইগুলি নির্গত হলে ঔষধের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। কার্যতঃ তাই দেখা গেল। শেষে লোকটি নিখুতভাবে সেরে উঠল।

মধু সম্পর্কে আরো বহু তথ্য রয়েছে। যেগুলি অবগত হওয়ার পর 'সর্বরোগ নাশক ভেষজ মধু' কথাটা সহজেই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

দুনিয়ার হেকীম, কবিরাজ ও ডাক্তার একবাক্যে মধুর বহুমুখী উপকারিতা স্বীকার

করেছেন। নিম্নে একজন খ্যাতনামা হেকীমের গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনের সারাংশ পাঠকবর্গের উপকারার্থে উদ্ধৃত না করে ক্ষ্যান্ত হতে পারছি না।

প্রাচীনকালে যখন মানুষ গুড়, চিনি, মিছরী ইত্যাদি তৈরী করতে শেখেনি, তখন আল্লাহ-প্রদত্ত এই মধুই মিষ্টি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। মিষ্ট-স্বাদ অনুভব করার একমাত্র উপকরণ ছিল মধু। পরে ধীরে ধীরে মানুষ ইক্ষু ইত্যাদির রস থেকে গুড়-চিনি ও মিছরি তৈরী করতে শিখল। আর মধু একটু দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং গুড়-চিনি সহজলভ্য হওয়ায় মধুর ব্যবহার কমে যেতে লাগল। এমন কি, ঔষধরূপেও ইহার ব্যবহার কম হয়ে গেল। অথচ গুড়-চিনি অপেক্ষা মধু বহুগুণে উৎকৃষ্ট বস্তু।

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধু সমতুল্য যদি কোন পানীয় থাকে, তবে একমাত্র দুধকেই বলা যেতে পারে। কারণ, দুধ একটা অমূল্য পানীয়। শরীরের গঠন ও তার শক্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে প্রোটিন, ভিটামিন ও ক্যালসিয়ামের আবশ্যক তা সবই দুগ্ধে বিদ্যমান আছে। তাই শিশুদের খাদ্য ও পানীয় উভয়বিধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য একমাত্র দুধই নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে এ কথা ঠিক যে, শরীরের পুষ্টি নিমিত্তে দুধের দ্বারা পানাহারের কাজ সুসম্পন্ন হলেও তাতে ঔষধের কাজ খুব কম হয়। পক্ষান্তরে মধুতে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন ইত্যাদি)ও আছে। এই কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন, "উহাতে মানুষের রোগমুক্তি আছে।"

মধুর খাদ্যগুণ

ডাঃ জে, কোমী বলেন, 'মধুর দ্বারা কার্বোহাইড্রেড, ক্যালসিয়াম বিশেষতঃ ভিটামিন বি' একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং সহজে হজমশীল আকারে শিশুদের শরীরে পৌঁছে থাকে। এ ছাড়া লৌহ ও ফসফরাস যে পরিমাণে দেহে প্রবেশ করে, তাও উপেক্ষা করা যায় না। এতে পায়খানা-প্রস্রাবও সহজে হয়।'

উপরোক্ত প্রখ্যাত ডাঃ আরো লিখেছেন যে, সুইজারল্যান্ডের একটি হাসপাতাল যেখানে শিশুদের 'রিকেটস' (শুকিয়ে যাওয়া) ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। ওখানে ওই সব শিশুদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় উষ্ণ দুধের সঙ্গে এক চামচ করে মধু মিশ্রিত করতঃ পান করানো হতো। ফলে দেখা গেছে যে, তাদের ওজন খুব আশ্চর্যজনক রূপে বৃদ্ধি হয়েছে। পরে ক্রমশঃ মধুর পরিমাণ চার চামচ পর্যন্ত বাড়ানো হতো।

মধুর রোগনাশক গুণ

১। মধুতে কোন প্রকার লবণ থাকে না। 'এলবুমেন'ও কম থাকে। এই কারণে মূত্রযন্ত্র (কিড্নী)-এর রোগে খুব উপকারী ওষুধ।

২। শিশুদের অন্ত্রের পীড়ায় অমোঘ ওষুধরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। বৃদ্ধদের দুর্বল হার্ট (হৃৎপিন্ড)কে শক্তি যোগান দেয়।

৪। বক্ষঃরোগ বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতায় জানা গেছে যে, যদি কারো শ্বাস-কষ্ট হয়, তবে তার নাকের সামনে এক পিয়ালা মধু রেখে বাতাস সঞ্চালন করতঃ তার ঘ্রাণ নাকে প্রবেশ করাতে পারলে শ্বাস-কষ্ট অনেকখানি কমে যাবে, হাঁপানিরও উপশম হবে।

৫। মধু চর্মরোগের মহৌষধ। যে কোন ঘা, ফোড়া, কার্বাঙ্কল, দূষিত ও পচা ঘায়ের উপর ওর ব্যবহার বেশ উপকারী। মধু দ্বারা খানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে পচা ঘায়ের উপর পটি বেঁধে রাখলে পুঁজ-রক্ত, পচা মাংস অপসারণ করে নতুনভাবে মাংস গজাতে সাহায্য করে। ফোড়া, কার্বাঙ্কলের উপর ঐভাবে পটি বাঁধলে তাকে ফাটিয়ে পুঁজ বের করে দেবে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডাক্তার লুয়ুক মাছের তেলের সঙ্গে মধু মিশ্রিত করে একটি মলমের কথা প্রকাশ করেছেন। যে মলমটির উপকারিতা তিনি 'হেমবার্গ' খৃষ্টান মিশনারী হাসপাতালে রুগীদেহে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, মধু ব্যবহারে দূষিত পচা ঘা সেরে যাচ্ছে বটে; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেই জায়গায় নতুন মাংসাঙ্কুর গজাতে বিলম্ব হচ্ছে। আবার পরে যখন দেখলেন যে, মাছের তেল মাংস গজাতে তীব্র ক্রিয়াশীল, তখন তিনি মধুর সঙ্গে ঐ তেল ব্যবহার করতে লাগলেন ও অত্যাশ্চর্য্য উপকার পেলেন।

মৌমাছির রোগনাশক গুণ

মৌমাছির যে দংশনে সাধারণতঃ আমরা খুব জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করি সেই দংশনই আবার গেঁটে বাতের জন্য খুব উপকারী।

'৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের এক প্রখ্যাত জেনারেল গেঁটেবাতের যন্ত্রণায় ঘায়েল হয়ে পড়েন। বহু ঔষধ ব্যবহার করলেন, কিন্তু তিনি রোগের কোন আরাম পেলেন না।

পরিশেষে তাঁকে নিদান চিকিৎসা হিসাবে মৌমাছির দংশন গ্রহণ করতঃ কষ্টমুক্তি পেতে হয়েছিল।'

প্রাচীনকালে শায়খ আবু আলী ইবনে সীনা ও অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত হেকীমগণের যুগে মৌমাছি খুব জন-প্রসিদ্ধ ঔষধ ছিল। মৌমাছিকে পেষণ করতঃ মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে চক্ষু-রোগে চোখের উপরে এবং দন্ত ও মাঢ়ীর রোগে দাঁত ও মাঢ়ীর উপরে লাগানো হতো। এমনকি, কার্বাঙ্কলের মত দূষিত ঘায়ে লাগিয়েও খুব উপকার পাওয়া যেত। মৌমাছিকে মধুর সঙ্গে গরম আঁচে পাকিয়ে আমাশয় রোগে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হতো।

হেকীম 'জালীনুস' বলেছেন, মৌমাছিকে মধুর সঙ্গে পিষে টাক মাথায় প্রলেপ দিলে টাক সেরে যায় এবং নতুন করে চুল গজায়।

জীবিত মৌমাছি মেরে পানিতে ডুবিয়ে রেখে যদি পাগল কুকুর দংশিত ব্যক্তি দৈনিক একটা করে মৌমাছি ভক্ষণ করতে পারে, তবে তার সেই কুকুরের বিষ নাশ হয়ে যাবে।

মৌমাছিকে পুড়িয়ে তার ছাই মধুতে মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে যাবতীয় চক্ষু-পীড়ায় বিশেষ উপকার দর্শে।

হোমিওপ্যাথিক মতেও জোড়ের ব্যথা, গেঁটেবাত এবং পালাজ্বরের জন্য মৌমাছি একটা ভাল ঔষধ বিবেচনা করা হয়েছে। *(হেকীম মুহাম্মাদ ইসমাইল 'নাহ' সম্পাদক 'সাদাকাত' পাটনা -এর সৌজন্য প্রাপ্ত।)*

কালোজীরার ভেষজ গুণ

বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে এ কথা শ্রবণ করেছেন যে, "কালোজীরাতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের আরোগ্যকারী গুণ আছে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৮৭পৃঃ)*

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, উপরোক্ত হাদীসে 'কালোজীরা'কে সর্বরোগনাশক ভেষজ বা ঔষধ বলা হয়েছে। কারণ, উহার ভেষজগত গুণ হচ্ছে শুষ্কতা ও উষ্ণতা। অতএব ইহা তার বিপরীত ধর্মী রোগ লক্ষণে -যেমন রস ও কফ জনিত ব্যাধিতে- বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্রিয়া করবে।

বলা বাহুল্য, আরব দেশে গরম ও শুষ্ক আব-হাওয়ার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রস

ও কফ জনিত ব্যাধিতেই সেখানকার মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাদের এই রকম পরিস্থিতিতে কালোজীরা অমোঘ ঔষধ।

প্রাচীন যুগে মুদ্রিত দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত একটি বই; যার নাম 'তা-লীফে এহ্সানী'। এই বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠায় কালোজীরার নিম্নোক্ত ভেজষগুণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।ঃ-

১। বায়ু নিঃসারক। ২। খাদ্যহজমকারী ও পাকাশয়ের শক্তি বর্দ্ধনকারী। ৫। কফজনিত যাবতীয় রোগনাশক। ৬। পিত্তদোষ নাশক। ৭। মাসিক স্রাব স্বাভাবিক কারক।

উপরোক্ত গুণাবলীর প্রতি একটু লক্ষ্য করে দেখলে আমরা সহজে সিদ্ধান্ত দিতে পারব যে, সত্যিই কালোজীরে বহু রোগনাশক ওষুধ। কারণ, পেটের জমা বায়ু নির্গত করে দেয়, কফ-শ্লেষ্মা, রস ইত্যাদিকে টেনে শোষণ করে নেয়, পাকস্থলীর হজমশক্তি বৃদ্ধি করে তোলে এবং নিস্তেজ ও দুর্বল দেহকে যে ওষুধ উত্তেজনা ও স্ফূর্তি দান করে- নিঃসন্দেহে সে ওষুধ বহু রোগনাশক ওষুধ।

এ্যালোপ্যাথিক বা ব্রিটিশ ফার্মেকোপিয়া মতেও এই জীরার উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তাতেও দেখছি সেই একই কথা বলা হয়েছে। প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রী পান্নালাল রায় এম, বি মহাশয় লিখেছেনঃ-

"জীরা প্রবল পচন নিবারণ। বেশী মাত্রায় সাধারণ উত্তেজকের ক্রিয়া করে। শিশুদিগের কলিক পেন হইলে পেটের ভিতর হইতে বায়ু নিঃসারণে সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। শেষোক্ত রোগে উহারা রিফ্লেক্স ক্রিয়া দ্বারা আক্ষেপ নিবারকের কার্য্য করিয়া থাকে। অল্পমাত্রায় গ্যাষ্ট্রিক সিক্রিশন্ও বৃদ্ধি করে। প্যানক্রিয়াসের সিক্রিশন্ও বৃদ্ধি করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইবার সময় রেসপিরেটরী মিউকাস মেমব্রেণের ক্রিয়া করিয়া কফ-নিঃসারকের কার্য্য করে। *(এ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা ৪৪৮ পৃঃ)*

বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে কালোজীরা মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে এর ক্রিয়া আরো বেশী কার্য্যকরী হবে - ইহাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা ইহাকে সিঙ্গারা, নিমকী, আচার ইত্যাদিতে মসলারূপে ব্যবহার করে থাকি। ওষুধরূপেও ব্যবহার করে আমরা আমাদের রুগীদেহে ইহার চমৎকার উপকার পেতে পারব। ([5])

([5]) মসলায় ব্যবহৃত জিরাও বড় উপকারী। মহানবী ﷺ বলেন, "জিরাতে মৃত্যু ছাড়া সর্বরোগের ঔষধ বর্তমান।" (নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৩০৩৪নং)

চন্দনকাঠের গুণাবলী

ইহার অপর নাম (আরবীতে) সন্দল, কুসত্ এবং উদে-হিন্দী। হিন্দুস্তানেই এই গাছের প্রধানতঃ উৎপাদন হয় বলে ইহাকে হাদীস গ্রন্থে 'উদে-হিন্দী' বলা হয়েছে। হেকীম ও কবিরাজী পুস্তকে চন্দন দু-রকম দেখানো হয়েছে। শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন। এই কাঠ খুবই উপকারী। এর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্য প্রণিধান করুন। তিনি বলেছেন, "শিশুদের কণ্ঠরোগে (ডিপথেরিয়া ইত্যাদিতে) উক্ত কাঠ ঘসে পানির সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ নাকের ছিদ্রপথে ফোটা ফোটা (Nasal Drop) আকারে প্রবেশ করাতে হবে এবং প্লুরিসী, নিউমোনিয়া ইত্যাদিতে বক্ষরোগে মুখ দিয়ে (Oral Drop) প্রবেশ করাতে হবে।" *(বুখারী, মুসলিম,মিশকাত ৩৮৭পৃঃ)*

উপরোক্ত হাদীসেই নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, উদে-হিন্দী সাতটি রোগের ঔষধ। তন্মধ্যে এ স্থলে তিনি দুটি রোগের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে ঔষধ সেবনের বা শরীর মধ্যে ঔষধ প্রবেশ করানোরও দু-রকম পদ্ধতি ব্যক্ত করেছেন। প্রথম, নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে (Nasal Drop), দ্বিতীয় মুখগহ্বরের পথ দিয়ে (Oral Drop)। 'তালীফে এহসানী' নামক হেকিমী গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় উহার একাধিক উপকারিতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথাঃ-

১। উহা ঘসে কিম্বা পেষণ করে সেবন করলে মনে ফুর্তি ও হার্ট (হৃৎপিন্ড) শক্তিশালী হয়।

২। বুক ধরফড়ানী (হার্ট পালপেটিশন) ব্যাধি যদি উষ্ণ বা গরম ধাতসহ হয়ে থাকে, তবে তা দূরীভূত হবে।

৩। উষ্ণ বা গরম ধাতের জ্বর ব্যাধিও সেরে উঠে।

৪। অতিরিক্ত পিপাসা লক্ষণ বিদ্যমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পিপাসা নিবারণের কাজ করে।

৫। পেটের জালা নিবারণেরও এর ভাল ক্রিয়া রয়েছে।

৬। পাতলা দস্ত - যদি রক্তামাশয় আকারে হয়ে থাকে, তবে 'রক্তচন্দন'

"তোমরা সানাপাতা ও জিরা ব্যবহার কর। কারণ, তাতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ওষুধ আছে।" (ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪০৬৭নং)

আর যদি সাদা আমযুক্ত হয়, তবে 'শ্বেতচন্দন' বিশেষ উপকারী।

৭। শিরঃপীড়ায় (মাথা ব্যথা) কপালে ও মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা ব্যথা উপশম হয়।

৮। ঘায়ের উপর প্রলেপ দিলে পুঁজ নিবারণ করে।

ভেষজবিদ পন্ডিতগণ উদে-হিন্দীর আরো অনেক উপকারিতা লিখেছেন। যথা- "প্রসূতিরা যদি ওর ধুনো গ্রহণ করে তবে তাদের রক্তস্রাব এবং প্রস্রাব ভালভাবে খুলে যায়। ইহার ব্যবহার রোগজীবাণু ধ্বংস করে। মস্তিষ্ক, স্নায়ু, যকৃৎ (Liver) শক্তিশালী হয়। পেটের জমা বায়ু নির্গত করতে সাহায্য করে। প্যারালাইসিস (অর্ধাঙ্গ) ব্যাধিতেও এর ক্রিয়া আছে। সেবন করলে পেটের কৃমিপোকা বের করে দেয়। ইহাকে পেষণ করতঃ মলম আকারে ব্যবহার করলে 'মেছেতা' ইত্যাদি দাগ মিটিয়ে দেয়। সর্দি-কাশীতেও এর ধুনো ব্যবহার খুবই হিতকর।"

সানা-পাতার গুণ

এ মর্মে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি মৃত্যুর কবল থেকে কোন জিনিসে মুক্তি থাকত, তবে তা 'সানা'তে থাকত।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন ঔষধ ও কোন ব্যবস্থা নেই; বরং সে রকম কোন ব্যবস্থা আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন নি।

নবী করীম ﷺ মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধরূপে সানাপাতাকে চিহ্নিত করেছেন। এ কথা ইউনানী হেকীমগণও স্বীকার করেছেন। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানবদেহে তিনটি দোষে রোগ-আক্রমণ হয়। ১মঃ পিত্তদোষ, ২য়ঃ কফদোষ এবং ৩য়ঃ শোণিত বা রক্তদোষ। বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত ঐ তিন দোষজনিত ব্যাধিতে 'জুলাপ' আকারে সানাপাতা বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। মানুষের দেহ থেকে সানাপাতা পিত্ত-কফ ও রক্ত এর দূষিত অংশগুলি জুলাপ আকারে বের করে দেয়। ফলে এইভাবে দেহ রোগমুক্ত হয়ে উঠে। ইহা ছাড়া সানাপাতা হার্ট (হৃৎপিন্ডকে)ও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি যোগান দেয়। *(মাযাহেরে হক জাদীদ ৪র্থ খন্ড ২৩ পৃঃ)*

আমাদের দেশীয় সানা (যেগুলি হিন্দুস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলে উৎপন্ন হয় - তার) থেকে সানা-মক্কী (যেগুলি আরবভূমীতে উৎপন্ন হয় তা) বেশী উপকারী। এই সানায়ে-মক্কী চর্মরোগে বিশেষতঃ পিত্তজ চুলকানিতে খুব ভাল ফল দান করে।

একাধারে জুলাপ, অন্যধারে হজমশক্তি বর্দ্ধক। এর ব্যবহারে শরীরে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ জমে থাকতে পারে না। এর ফল স্বরূপ শরীর রোগ আক্রমণ থেকেও অব্যাহতি পায় এবং শরীরের রূপ-লাবণ্যও অটুট থাকে। *(রাহবারে কামেল ১৮৫ পৃঃ)*

'তালীফে এহসানী' গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় সানাপাতার ধাতুগত গুণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, 'উহা গরম ও শুষ্কজাত দ্রব্য। কফ, পিত্ত ও রক্ত দোষজনিত কোষ্ঠবদ্ধতায় জুলাপের কাজ করে। শরীরের ক্ষতিকর পদার্থগুলিকে দূরীভূত করে শরীরকে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ রাখে। বিশেষতঃ কফ ও পিত্তজনিত রোগসমূহে ইহার ব্যবহার খুবই উপকারী।' এ্যালোপ্যাথিক মতেও ইহার ব্যবহার রয়েছে বেশ। এ্যালোপ্যাথিক মেটেরিয়াতেও 'উহা একটি সুন্দর বিবেচক ঔষধ' বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ডিসপেপসিয়া ও প্রবল কোষ্ঠকাঠিন্যে সানা ব্যবহার হয়।' *(মেটিরিয়া ৮৩৬ পৃঃ)*

মেহেদীর গুণ

জননী আয়েশা (রাঃ) বলেন, "যখন রসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের কোন অঙ্গ ছুরি ইত্যাদিতে কেটে যাওয়ার ফলে জখম হয়ে পড়ত অথবা পাথর ইত্যাদিতে চোট লেগে ক্ষত-বিক্ষত হতো, তখন তিনি আমাকে ক্ষতস্থানে মেহেদীর পুলটিশ লাগাতে বলতেন।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

মেহেদীর ভেষজগুণ হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ; অর্থাৎ, মাঝামাঝি ঠান্ডা ও মাঝামাঝি গরম। উহার ঐ শীতলতা জখমের তাপ ও জ্বলনকে দূরীভূত করতঃ আরাম দান করে। এই কারণেই অন্য এক হাদীসে দেখা যায় যে, যখন কারো পায়ে জখম ও ব্যথা হতো তখন নবী করীম ﷺ বলতেন, "মেহেদী পেষণ করতঃ দুই পায়ে উহার প্রলেপ দিয়ে দাও।" *(আবু দাউদ, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

প্রাকৃতিক গাছ-গাছড়াকে নিয়ে যাঁরা রূগীদেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সেই সমস্ত হেকীমগণও মেহেদীর উপরোক্ত উপকারিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। হেকীমগণ উহার আরো কয়েকটি গুণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যথাঃ-

১। যাবতীয় শিরঃপীড়া বা মাথায় যন্ত্রণায় মেহেদী পাতার রস মাথায় মালিশ করা খুবই হিতকর।

২। মেহেদী পাতাকে পানির সঙ্গে পিষে তদ্দ্বারা কুল্লী করলে জিহ্বার ছোট ছোট

ঘায়ে এবং মুখগহ্বরের প্রদাহ নিবারণে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩। পাতা ফুল ও বীজ একত্রে পিষে পরিমাণ মত দিন কয়েক সেবন করলে রক্ত পরিষ্কাররূপে কাজ করে। *(তাঃ এহসানী ২০ পৃঃ)*

ছত্রাক বা পেনিসিলিনের ভেষজ গুণ

বিখ্যাত সাহাবী হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رضي الله عنه বলেন 'আমি নবী ﷺ থেকে বলতে শুনেছি যে, [illegible]

অর্থাৎ, ছত্রাক মান্ (নবী মূসা عليه السلام ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ একটি বেহেশ্তী খাদ্য) জাতীয় জিনিস আর ওর নির্যাস চক্ষুপীড়ায় জন্য অমোঘ ঔষধ। *(বুখারী ৮৫০ পৃঃ)*

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, কতকগুলো লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে এসে ছত্রাক সম্পর্কে মন্তব্য করলেন এই বলে যে, ইহা (মৃত্তিকার দূষিত পদার্থ) বসন্ত ঘা স্বরূপ। ইহা শ্রবণ করে নবী করীম ﷺ বললেন, "নাঃ তোমরা যা ভেবেছ তা নয়; বরং উহা (কুরআনে বর্ণিত) 'মান্' জাতীয় জিনিষ আর ওর রস চক্ষুপীড়ায় ঔষধ। আরো শুনো, 'আজওয়াহ' খেজুর জান্নাতের ফল, ওতে বিষনাশক শক্তি আছে।" ইহা শ্রবণ করতঃ আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, আমি ৩, ৫ অথবা ৭টা ছত্রাক পিষে ওর আরক একটি শিশিতে পুরে রাখলাম এবং আমার এক দাসীর পীড়িত চক্ষুতে ওর ড্রপ ব্যবহার করাতে সে সম্পূর্ণ সেরে উঠল। *(তিরমিযী, মিশকাত ৩৯১ পৃঃ)*

বর্ষাকালে সেঁতসেঁতে ও আবর্জনাবিশিষ্ট স্থানে আপনা-আপনি মৃত্তিকা উপরে ছোট ছোট ছাতা আকৃতিবিশিষ্ট যে উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে - আমরা তাকে ছাতাপড়া বলি। শুদ্ধ ভাষায় ওকে ছত্রাক বলে, ইংরাজীতে বলে Fungi, আর হাদীসে তাকে 'কামআহ' বলা হয়েছে।

নবী করীম ﷺ-এর যুগে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে, দেহের দূষিত পদার্থ যেমন বসন্তরূপে চর্মের উপর দেখা যায়, তেমনই ছত্রাকও মৃত্তিকার দূষিত পদার্থ ভূপৃষ্ঠে গজিয়ে উঠে। ছত্রাকের রোগনাশক শক্তি তাদের জানা ছিল না। কিন্তু ভেষজবিদ্ নবী করীম ﷺ তার রোগনাশক শক্তি সম্পর্কে ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি তাদেরকে ওর উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত

সাহাবী আবু হুরাইরা ﷺ ছত্রাকের রস বের করে এবং ওর আরক কার্যতঃ ব্যবহার করতঃ নবী ﷺ এর উক্তির যথার্থতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করেন।

আল্লামা ইমাম নওবী (রঃ) বলেন, আমাদের এই যুগেও আমি এবং আরো অনেকে দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে এ রকম একটি লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি যে, তার চক্ষুতে ছত্রাকের প্রলেপ লাগানোতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। *(কাসতালানী, বুখারী শরীফের টীকা ৮৫০ পৃঃ)* (৭)

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ সালে যাঁর দ্বারা হুযুরের ছত্রাক সম্পর্কিত উক্তির যথার্থতা প্রমাণ হয় - তাঁর নাম, আলেকজান্দার ফ্লেমিং। "উনি লক্ষ্য করলেন যে, পেনিসিলিয়াম নোটেটাম ছত্রাকের কীটাণু নাশ করার ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে Gram Positive জাতীয় বীজাণু এর ধ্বংস শক্তি ওর মধ্যে আছে। ফ্লেমিং এর নাম দিলেন, 'পেনিসিলিন'। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অধ্যাপক ফ্লোরে (Florey) এবং তাঁর সহকর্মীরা এই ছত্রাকের চাষ করে ওর থেকে ক্রিয়াশীল উপাদানওয়ালা পেনিসিলিন দানা শুদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করেন এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ শুরু হয়।" *(এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা ৫১১ পৃঃ By ডাঃ পান্নালাল রায়)*

রুগীদেহে পেনিসিলিনের ব্যবহার যে কত ফলপ্রসু এবং কত ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এন্টিবায়োটিকস্ (বীজাণু ধ্বংসকারী) রূপে ইঞ্জেকশন, ট্যাবলেট, মলম, ড্রপ আকারে উহার ব্যবহার সর্বজন বিদিত। আর এর উপর গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতকের ২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে। এ কথা স্বীকার করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তারও আগে অর্থাৎ, ১৩/ ১৪ শত বছর পূর্বে নবী মুহাম্মাদ ﷺ ঐ পেনিসিলিন বা ছত্রাকের রোগনাশক শক্তির আবিষ্কারক ছিলেন। সেই সঙ্গে কার্যতঃ রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ওর প্রয়োগও তাঁর যুগে আরম্ভ হয়েছিল।

নোটঃ- ছত্রাককে কোন শোধন ব্যবস্থায় না এনে আস্ত-ছত্রাক একটু বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে।

(পেনিসিলিন প্রবন্ধটি আহলে হাদীস পত্রিকার কার্ত্তিক ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত)

---

(৭) জ্ঞাতব্য যে, চোখের পীড়ায় মহানবী ﷺ ঘৃতকুমারী বা মুসব্বরও ব্যবহার করতেন। (মুসলিম, সহীহুল জামে' ৩৪৫নং)

কর্পূরের গুণাবলী

কর্পূরের উল্লেখ রয়েছে কুরআন শরীফের সূরা 'দাহ্‌রে' ঃ-

(([illegible]))

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ কর্পূর মিশ্রিত পানপাত্র হতে পান করবে। *(সূরা দাহ্‌র ৫ম আয়াত)*

কর্পূর একটি বায়ুনাশক ও পচন নিবারক ঔষধ। সেই সঙ্গে উত্তেজক, চর্মপ্রদাহ নিবারক, পেটের আক্ষেপ বা বেদনা-নাশক ঔষধও বটে।

পচন-নিবারক ও দুর্গন্ধ-নাশক হিসাবে মহা বিজ্ঞানী হযরত রসূলে করীম ﷺও ব্যবহার করার নির্দেশ দান করেছেন। যেমন হাদীস গ্রন্থে মৃতের গোসল প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "গোসল শেষে মৃতের সর্বাঙ্গে 'কর্পূর' অথবা ঐ জাতীয় কোন জিনিস মর্দন করে দেবে। " *(বুখারী ১৬৮-পৃঃ)*

এই হাদীসের ব্যাখ্যাকারকগণ বলেছেন, গোসল শেষে কর্পূর মাখানোর তাৎপর্য এই যে, তাহলে তা দেহ থেকে ধুয়ে যাবে না; বরং শরীরে লেগে থাকলে পচন নিবারক ও দুর্গন্ধনাশক এবং ফিরিশ্তাদের উপস্থিতিকালে সুগন্ধির কাজ দেবে। *(মিরআত ৩য় খন্ড ৪৬০পৃঃ)*

বলা বাহুল্য যে, কর্পূরের ঐ বহুবিধ উপকারিতার কথা ডাক্তারী, হেকিমী ও কবিরাজী শাস্ত্রে অকপটে স্বীকার করা হয়েছে। মাননীয় ডাক্তার পান্নালাল রায় মহাশয় লিখেছেন ঃ-

"অন্যান্য ভোলাটাইল তৈলের ন্যায় (কর্পূর) পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর স্থানিক বায়ুনাশকের কার্য করে---।"

"অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে রক্তের শ্বেত কণাসমূহ বৃদ্ধি পায়। কর্পূর কেবল প্রবল বায়ুনাশক নহে; ইহা একটি পচন নিবারক ঔষধ। ডায়েরিয়া ও কলেরা রোগে ব্যবহার হইয়া থাকে।-----।"

"-৫ গ্রেন মাত্রায় ৬ ঘন্টা অন্তর সেবন করালে হিষ্টিরিয়া, ডিসমেনোরিয়া (কষ্টরজঃ বা বাধক বেদনা) ও অন্যান্য আক্ষেপযুক্ত রোগে বিশেষ ফল দর্শায়। স্তনের দুগ্ধ নিবারণে ক্যাম্ফর (কর্পূর) একটি মহৌষধ। ১ ভাগ ক্যাম্ফর ৪ ভাগ অলিভ অয়েলে গলাইয়া উহার ৩০ মিনিম (ফোঁটা) হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশন করিলে নিউমোনিয়া রোগে হার্টের ষ্টিমুল্যান্টের (উত্তেজক) কার্য করে।" *(এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা ৪৩৫ পৃঃ)*

মলম আকারে বাত-বেদনার উপর মালিশ করলে বেদনা উপশম হয়। অনেক সময় জননেন্দ্রিয়ের ধারে-পাশে এক ধরণের একজিমা হয়। সেই ক্ষেত্রে তার চুলকানি নিবারণের জন্য হাফ ড্রাম কর্পূর ১ ড্রাম জিঙ্ক অয়েন্টমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে বিশেষ উপশম পাওয়া যায়।

আজকাল বাজারে কর্পূর হতে প্রস্তুত খাবার ঔষধ - 'একোয়া ক্যাম্ফর', 'স্পীরিট ক্যাম্ফর', লাগাবার মলম 'লিনিমেন্ট ক্যাম্ফর' ইত্যাদি পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালের হেকীমগণের গবেষণায় দেখা যায় যে, কর্পূর হলো একটি গাছের আঠা। ইহা সেবনে মন ও মস্তিকে ফুর্তি আসে, পিপাসা নিবারণ করে। তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাখলে বা মালিশ করলে 'উকুন' ও 'চুলকানি' নিবারণ হয়। বেশী মাত্রায় ব্যবহার ক্ষতিকর; শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়, বল-বীর্য্য দুর্বল হয়। তাই একটু সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। *(তালিফে এহসানী ৪১পৃঃ)*

আদা বা শুঁঠের গুণাবলী

ইহার উল্লেখ রয়েছে কুরআন শরীফের ঐ সূরা দাহরেই। যথা ঃ-

(([illegible]))

অর্থাৎ, সেখানে (জান্নাতে) তাদের (পুণ্যবানগণ)কে আদ্রক মিশ্রিত পানপাত্র হতে পান করানো হবে। *(ঐ সূরা ১৭ নং আয়াত)*

কর্পূর ও আদ্রক মিশ্রিত পানীয় (শরবৎ) আরব জাহানে এক উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় পানীয়। যা অতি সহজে গলাধঃকরণ হয় এবং ওর সুগন্ধে মন-মেজাজ পরিতৃপ্ত ও উৎফুল্ল হয়। *(সাফওয়াতুত্ তাফাসির ৩১ খন্ড ৪৯৪ পৃঃ)*

ইহা ছাড়া শুঁঠ বা আদার রাসায়নিক গুণ আছে অনেক। হেকীমগণ ওর উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। মনুষ্যদেহে পাকাশয় ও যকৃৎ (লিভার) যন্ত্র দুটি খুব প্রয়োজনীয় যন্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। বলা বাহুল্য, আদা বা শুঁঠ ভক্ষণে ঐ দুটি যন্ত্র শক্তিশালী হয়। খাবারের রুচী আনয়ন করে, ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করে। সর্দি-শ্লেষ্মা, কফ ইত্যাদি রস নিবারণ করে। ওর ব্যবহারে পক্ষাঘাত রোগে উপকার দর্শে গেঁটে বাত বেদনার উপশম করে। বাত-বেদনায় আক্রান্ত অঙ্গে আদা বা শুঁঠ পেষণ করতঃ ওর প্রলেপ লাগালে আরাম পাওয়া যায়। যদি এই প্রলেপের সঙ্গে একটু কর্পূর মিশ্রিত করা হয়, তবে ব্যথা নিবারণ শক্তি বেড়ে যাবে। কর্পূরের

ন্যায় শুঁঠের বায়ুনাশকের কার্য্য করে। বিশেষতঃ ঠান্ডালাগা রোগে আদা ও শুঁঠের ব্যবহার আজ সর্বজন বিদিত। তবে আদা অপেক্ষা শুঁঠের কার্য্যকারিতা বেশী। *(বিস্তারিত বিবরণ তালীফে এহসানী ২৮-পৃঃ)*

(কর্পূর ও শুঁঠের গুণাবলী আহলে হাদীস জানুয়ারী ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত)

যয়তুন ফলের রাসায়নিক গুণ

মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফে বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে যয়তুন বৃক্ষের উল্লেখ এসেছে। বলা হয়েছে, (([illegible]))

অর্থাৎ, যয়তুন বৃক্ষ বরকত পূর্ণ (সমৃদ্ধ) বৃক্ষ ---। ([7]) *(সূরা নূর ৩৫ আয়াত)*

তফসীরকারগণের নেতা হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ওর ব্যাখ্যায় বলেন, 'ঐ বৃক্ষে অনেক উপকার রয়েছে। (যয়তুন) তরকারীরূপে খাওয়া হয়, ওর তেল শরীরে মালিশ করা হয়। প্রদীপে জ্বালানো হয় এবং রংও করা হয়। ওর পাতা ও কাঠ জ্বালানীর কাজে লাগে। এমন কি ওর ভস্ম (ছাই)ও কাজে লাগে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বৃক্ষ যয়তুন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল। 'তুফানে নূহের (عليه السلام) পরেও প্রথমে যয়তুন বৃক্ষ গজিয়ে উঠেছিল। আর এই বৃক্ষটির বরকত বা সমৃদ্ধির নিমিত্তে ৭০ জন নবী প্রার্থনা করেছিলেন। তম্মধ্যে হযরত ইব্রাহীম عليه السلام ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ অন্যতম। নবী করীম ﷺ দুআ করে ছিলেন এই বলে,

.[illegible]

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি তেল ও যয়তুনে বরকত দান কর। *(তফঃ জালালায়নের টীকা ২৯৯ পৃঃ)*

([β]) *বরং তার গুরুত্বের জন্যই মহান সৃষ্টিকর্তা সূরা তীনের শুরুতে তার কসম খেয়েছেন।*

'যয়তুন' আরবী শব্দ। বাংলা ভাষায় উহাকে 'জলপাই' বলে, আর জলপাই তৈলের ইংরাজী হলো 'অলিভ অয়েল'।

জলপাই বা অলিভ অয়েলের কার্য্যকারিতার কথা কোন্ ডাক্তারই বা না জানে! ঐ দেখুন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোষ্টকাঠিণ্যের আনুষঙ্গিক চিকিৎসার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "অলিভ অয়েল (বা জলপাই তৈল) স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও মৃদু বিরেচক। ইহা সেবনে পিত্তনিঃসরণে সহায়তা করে। অথচ বিরেচক (জুলাপকারী) ঔষধে সচরাচর শরীরের যেরূপ অনিষ্ট হয় ইহাতে সেরূপ হয় না।" *(পারিবারিক ৪৮-পৃঃ)*

পিত্তপাথুরি (Gall-Stone) ব্যাধি খুব মারাত্মক রোগ। এই রোগের আনুষঙ্গিক চিকিৎসায় মাননীয় ডাক্তার মহাশয় লিখেছেন, "প্রতিদিন দুইবার আধ আউন্স বিশুদ্ধ জলপাই তৈল (Olive-Oil) সেবনে বেশ ফল হয়, পুনারক্রমণের আশংকা কমিয়া যায়।" *(পারিবারিক ৪৭৮-পৃঃ)*

যয়তুন অর্থ জলপাই জেনেছি। কিন্তু মূল্যবান এই জলপাই তৈল কিভাবে প্রস্তুত হয় তা জানা যায়নি। এক্ষণে তাই আমরা এ্যালোপ্যাথিক মেটেরিয়া থেকে তা জানতে পারব। এই তৈল পাকা 'যয়তুন' ফল পেষণ করতঃ বের হয়। এই তেল অধিক মাত্রায় ২ থেকে ৪ আউন্স পেটে খেলে যন্ত্রণাশূন্য নরম মল বের হয়। ইহার স্নিগ্ধকারক গুণ থাকায় কোষ্ঠ, প্রদাহ বা ক্ষতযুক্ত অর্শের ঘায়ে বিশেষ উপকারী। জুলাপের জন্য ৫ থেকে ২০ আউন্স ব্যবহার হয়। গ্যাষ্টিক ও ডিওডিন্যাল আলসারেও ব্যবহার করা হয়। একটি ব্লু পিল খাবার ১২ ঘন্টা পরে ৬ আউন্স অলিভ অয়েল প্রয়োগ করলে প্রচুর পরিমাণে গলষ্টোন (পিত্তপাথুরি) বের হয়ে যায়। *(ডাঃ পান্নালাল রায়কৃত মেটেরিয়া মেডিকা ৭১১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)*

দুগ্ধের খাদ্যগুণ ও উপকারিতা

এই মর্মে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেছেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু (গবাদি পশু)তে তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় সৎ উপদেশ রয়েছে। যেমন, ঐ গবাদি পশুর পেটে হজমকৃত ভুক্তদ্রব্য এবং রক্তের মধ্য হতে খাঁটি দুগ্ধ আমি তোমাদের পান করাই। যা পানকারীদের নিমেত্তে এক সুপেয় ও

সহজে গলাধঃকরণশীল বস্তু। *(সূরা নাহল ৬৬ আয়াত)*

আমাদের জীবন ধারণের জন্য নানা রকম শস্যজাত খাদ্য বিভিন্ন পানীয় বস্তু পান করাও অত্যাবশ্যক। কেবল খাদ্য খেয়ে যেমন স্বাস্থ্য-শরীর রক্ষা করা কঠিন, তেমনি শুধু পানীয় বস্তু পান করেও শরীর রক্ষা করা সুকঠিন। দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই যা খাদ্য ও পানীয় উভয়ই কাজ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এই দুধ এমন একটি মূল্যবান বস্তু যা খাদ্য ও পানীয় উভয়েরই কাজ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ-প্রদত্ত এই দুধ এমন একটি মূল্যবান বস্তু - যা খাদ্য ও পানীয় উভয়েরই কাজ করে থাকে। এই জন্যেই ভেষজবিদ নবী করীম ﷺ অন্যান্য খাদ্য ভক্ষণ করে দুআ করতেন এই বলে, “হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যে খাদ্য দান করছে তাতে বরকত দাও এবং এর থেকে আরো উত্তম খাওয়াও। কিন্তু দুধ পান করে অন্য রকম দুআ করতেন। অর্থাৎ বলতেন, “আল্লাহ! তুমি ইহাতে (দুগ্ধে) বরকত দান করো এবং ইহা আরো বেশী করে দান করো।” “এর থেকে উত্তম খাদ্য দান করো” - এ রকম কথা দুধপান করে বলতেন না। কারণ দুধ থেকে উত্তম খাদ্য ও পানীয় আর কিছু নেই। ([৪])

আমরা যে সমস্ত খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার করে থাকি তাতে ভিটামিন, প্রোটিন, চর্বি, শর্করা ইত্যাদি মূল্যবান বস্তুগুলি থাকে। যেগুলি আমাদের শরীর গঠনে ও স্বাস্থ্যরক্ষায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। দুগ্ধের খাদ্যগুণ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন যে, দুগ্ধে ভিটামিন এ,বি,সি, বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ভিটামিন 'এ' যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আবার প্রতি ১০০ গ্রাম দুগ্ধে শতকরা ৩.৫ ভাগ প্রোটিন, ৩.৫ ভাগ চর্বি ৫ ভাগ শর্করা এবং ৬৬ ক্যালরি শক্তি উৎপাদন করে। *(এ্যালোঃ মেটিঃ মেডিকা ১৪৪-১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

উপরোক্ত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, শরীর গঠনে ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তে যে সমস্ত খাদ্যপ্রাণ ও প্রোটিন ইত্যাদির প্রয়োজন তা সবই দুগ্ধের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। প্রশংসা একমাত্র সেই পরম বিজ্ঞানময় আল্লাহর - যিনি পরিপাককৃত ভুক্তদ্রব্য এবং রক্তের মাঝামাঝি পর্য্যায় থেকে ঐ মূল্যবান বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন। অথচ দুগ্ধে

([৪]) মহানবী ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ যে রোগ দিয়ে থাকেন, তার ওষুধও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা গাই-দুধ ব্যবহার কর। কারণ, সে সব ধরনের গাছ-গাছড়া খেয়ে থাকে।” (আহমাদ, সহীহুল জামে' ১৮০৮নং)

ভুক্তদ্রব্যের কিম্বা রক্তের কোন রূপ-রং, গন্ধ মিশ্রিত থাকে না। কুরআনে তাই তিনি বলেছেন, [illegible] (খাঁটি বা পিওর দুধ)।

এই দুধ থেকে ছানা ও ছানা থেকে অসংখ্য ধরণের মিষ্টান্ন তৈরী হয়। আবার দুধ থেকে যেমন মাখন, মাখন থেকে ঘি তৈরী হয়, তেমনি তৈরী হয় দই ও পনীর। কী আশ্চর্য পদার্থ!

প্রাচীন কালের হেকীমগণ দুগ্ধের রাসায়নিক গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, দুগ্ধের ধাতুগত গুণ হচ্ছে ঠান্ডা ও শীতলতা। অতএব শরীরের তাপ ও জ্বালা নিবারণে উপকারী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূরকারী। তাড়াতাড়ি হজমশীল বস্তু। মস্তিষ্ক ও সর্বাঙ্গ স্নিগ্ধকারক। ইহা সেবনে বীর্য তৈরী হয় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে হার্টের দ্রুত স্পন্দন বা 'বুক ধড়ফড়ানি' ব্যাধি হয়। এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। লাগাতার বেশ কিছুদিন পরিমাণ মত মধু পান করলে হার্ট শক্তিশালী হয় এবং 'বুক ধড়ফড়ানি' রোগ সেরে যায়। *(তাঃ এহসানী ৭৪ পৃঃ)*

বাহ্যিক সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে চিকিৎসা

নবী করীম ﷺ যেমন ভেষজ ও দ্রব্যগুণ দ্বারা রোগ নিরাময়ের সাম্ভাব্য ব্যবস্থাপত্র দান করেছেন, তেমনি বাহ্যিক সেবা ও পরিচর্যারও বেশ কিছু ব্যবস্থা দান করেছেন। নিম্নে তার কতিপয় উদাহরণ পেশ করতে প্রয়াস পাব।

১। জ্বরের তাপ কমানোর উপায় ঃ-

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

[illegible]

অর্থাৎ, "জ্বর নরকাগ্নির এক রকম তাপ বিশেষ। অতএব পানি দ্বারা তাকে ঠান্ডা করো।" *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

আমাদের শরীরের সাধারণ তাপ ৯৮°-৯৯° ডিগ্রি। যখন কারো তাপমাত্রা ওর থেকে বৃদ্ধি হয় তখন তার শরীরে জ্বর হয়েছে বলে জানতে পারি। এক্ষণে যদি কারো শরীরের তাপ ১০২°-১০৩° ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়, তবে সেটা প্রবল জ্বর বলে আমরা মনে করি। এই প্রবল জ্বর অবস্থায় রুগীর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠে,

রুগী ভুল বকে, অনেক ক্ষেত্রে রুগী তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। শিশুদের ক্ষেত্রে 'তড়কা' বা উপর দিকে চোখ তুলে দেয়া, খেঁচুনি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। জ্বরের এই অবস্থাটা অশুভ লক্ষণ। এই অশুভ লক্ষণের আশু উপশম ব্যবস্থা হচ্ছে- 'পানি ঢালা' ব্যবস্থা। রুগীর মাথায় অথবা কপালে অথবা পায়ের তলায় ঠান্ডা ও শীতল পানি ঢালা কিম্বা শীতল পানি পান করানো একটা স্বতঃসিদ্ধ ও সুব্যবস্থাই বটে এতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আরব দেশে যেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সূর্যের প্রখর তাপ (লু হাওয়া) জনিত লোকের জ্বর হয়ে থাকে, সেখানে রুগীর সর্বাঙ্গ শরীরে ঠান্ডা পানি বহে দেওয়া বা শীতল পানির টবে শরীর ডুবিয়ে রাখা খুব চমৎকার ব্যবস্থা। নবী করীম ﷺ-এর ব্যবস্থিত পানি ঢালা ব্যবস্থা রুগীর দেহে কত যে উত্তম প্রক্রিয়া, তা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রবল জ্বর অবস্থায় আমাদের দেশেও বরফ বা শীতল জলের প্রয়োগ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এ মর্মে প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রী কিরণচন্দ ঘোষ (এল, এম, এস) মহাশয় তাঁর প্রকাশিত প্রাক্‌টিস অফ মেডিসিন (১ম খন্ড) গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ-

"১০৩° ডিগ্রি জ্বর (টায়ফয়েট) হইলেই আইস ব্যাগ (Ice Bag) ব্যবহার করিবে। একটি মাথায় ও একটি ঘাড়ে দিবে। যদি দেখ, রোগী হাত দিয়া আইসব্যাগ সরাইয়া দিতেছে, তাহা হইলে উহা বন্ধ করিবে। পল্লী গ্রামে বরফ ও আইসব্যাগ পাওয়া সুকঠিন। সে ক্ষেত্রে রোগীর মাথা ন্যাড়া করিয়া দিয়া শীতল জলে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া সমস্ত মাথায় ঐ ন্যাকড়ার পটি দিবে। যেন শীতল জলের পটি সর্বদা ভিজা থাকে। ন্যাকড়া শুষ্ক না হইতে আবার ভিজাইয়া দিবে।"

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার দীন লেখক দীর্ঘদিন ধরে একটু চিকিৎসার কাজ করে আসছে। এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় খুব ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছি যে, প্রবল জ্বর লক্ষণে ৫/৭ ঘটি পানি রুগীর মাথায় ঢালাতে থার্মোমিটারে দেড়-দু ডিগ্রি জ্বর নেমে গেছে। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে রুগীর ভয়ানক অবস্থা কেটে স্বাভাবিক অবস্থা আয়ত্বে এসেছে। অতএব প্রবল জ্বর লক্ষ্য করলেই গৃহ কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে, ডাক্তার আসার আগে বা ঔষধ-পথ্য সেবন করার পূর্বে রুগীর মাধায় (হুযুরের নির্দেশ পালনার্থে) পানি ঢালা ও কপালে ভিজা ন্যাকড়ার পানপটি ঘন-ঘন দিবার ব্যবস্থা করা।

২। বিচ্ছু-ভীমরুলের জ্বালা নিবারণের উপায় ঃ-

একদা রাত্রে হুযুর করীম ﷺ নিজের অভ্যাসমত নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ছিলেন। সিদজা করাকালে মাটির উপর হাত পড়তেই একটা বিচ্ছু তাঁর আঙ্গুলে দংশন করে দেয়। ফলে তিনি জুতো দ্বারা বিচ্ছুটাকে মেরে ফেলেন এবং মন্তব্য করেন এই বলে যে, "বিচ্ছুর উপর আল্লাহর লানৎ (অভিসম্পাত) হোক; সে নামাযরত ও নামায থেকে মুক্ত কোন মানুষকেও ছেড়ে দেয় না; অথবা নবী ও নবী ছাড়া অন্য কাউকেও ছাড়ে না। সুযোগ পেলেই দংশন করে।"

অতঃপর হুযুর করীম ﷺ লবণ ও পানি আনিয়ে একটি পাত্রে মিশ্রিত করে নিলেন। তারপর আঙ্গুলের আক্রান্ত স্থানে উক্ত লবণ মিশ্রিত পানি ঢালতে লাগলেন, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে আঙ্গুলটা একটু করে মলে দিচ্ছিলেন, আর মুখে 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' সূরা দুটি পড়ে যাচ্ছিলেন। *(বায়হাকী, মিশকাত ৩৯০ পৃঃ)*

উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষেত্র বিশেষে রসুলুল্লাহ ﷺ 'দাওয়া' (ঔষধ) এবং 'দুআ' উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। অতএব আমরা বোলতা-ভীমরুল, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে উপরোক্ত নবী প্রদত্ত দুআ এবং 'দাওয়া' (ঔষধ) ব্যবহার করতঃ উপকৃত ও ধন্য হতে পারি।

আমি লিখতে বসে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, নবী ﷺ-এর উপরোক্ত 'লবণ-জল' ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণও স্বীকার করেছেন। ঐ দেখুন, সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি লিখছেন!

"ভিমরুল, বোলতা, বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে দষ্টস্থান হইতে প্রথমে ছুরী দিয়া হুলটি বাহির করিতে হইবে। পরে স্পিরিট ক্যামফার অথবা সরিসার তৈল বা কেরোসিন তৈল কিম্বা তামাক বা হুকার জল কিম্বা নস্য অথবা 'লবণ মিশ্রিত-জল' কিম্বা টিংচার আয়োডিন অথবা একটি পেঁয়াজ কাটিয়া লাগাইয়া দিতে হয়।" *(পারিবারিক চিকিৎসা ৭২০পৃঃ)*

অন্যত্রে আরো এক রকম পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। তা হচ্ছে এই ঃ-

"যদি কোন অঙ্গে বিচ্ছু কামড়ায়, তাহার বিপরীত অঙ্গের কর্ণরন্ধ্র মধ্যে (অর্থাৎ দক্ষিণ অঙ্গের যে কোন স্থানে কামড়াইলে বাম অঙ্গের কর্ণরন্ধ্রে এবং বাম অঙ্গের যে কোন স্থানে কামড়াইলে দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্রে) সামান্য গরম জলে একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া উহা ৪/৫ বার ঢলিয়া দিলে উপকার দর্শে। চারি বা পাঁচবার ঐরূপ লবণাক্ত

জল কানে ঢালিয়া দিবার পর যদি কোন উপকার পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ঈষৎ গরম জলে সাবান ফেনাইয়া তৎসহ অল্প চিনি মিশাইয়া ৪/৫ বার উহা কানে ঢালিয়া দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নাকি অবিলম্বে নিবৃত্ত হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।" *(পারিবারিক চিকিৎসা ৭২২ পৃঃ)*

প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "মাছের কাঁটা ফুটিয়া যাতনা হইলে গরম জলে সোরা বা লবণ ঘুলিয়া তাহাতে আহত স্থানটি ডুবাইয়া রাখিলে উপকার দর্শে।"

"মাকড়সা চাটিলে ঘি ও লবণ মিশাইয়া লাগাইলে উপকার হইতে পারে।"

"সাধারণ কুকুর কামড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থানটি গরম জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ সেই স্থান কষ্টিক দিয়া পোড়ানো বা পারমাঙ্গানেট অভ পটাস গুঁড়ো ছিটাইয়া দেওয়া ভাল।" *(পারিবারিক চিকিৎসা ৭২১ পৃঃ)*

৩। সর্প দংশনের চিকিৎসা ঃ-

এ প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের উপকারার্থে দুই রকম ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করছি; ১ম আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা এবং ২য় বাহ্যপ্রক্রিয়া ব্যবস্থা।

প্রথম চিকিৎসার উল্লেখ হাদীস গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ণ বয়ানসহ হাদীসটি উদ্ধৃত করছি। যথা ঃ-

বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত যে, একদা একদল সাহাবী সফরে বের হন এবং আরবের পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত একটি গোত্রের কাছে গিয়ে তাঁরা পৌঁছে কিছু পানাহারের সৌজন্যমূলক ব্যবস্থা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তারা ইহার ব্যবস্থা দিতে অস্বীকার করে বসল। ইত্যবসরে ওদের সর্দার বা দলপতিকে সর্পে দংশন করে ঘায়েল করে দিয়েছে। উপশম উদ্দেশ্যে গোত্রের লোকেরা রকমারি ব্যবস্থার জন্য ছুটোছুটি করে কোন লাভ হয় নি। নৈরাশ্য অবস্থায় ওদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'আমাদের এখানে আগত ঐ দলটির কাছে গেলে ভাল হতো, হয়ত ওদের মধ্যে কারো কিছু তদবীর জানা থাকতে পারে।' এ কথা শ্রবণ করতঃ লোকেরা তাঁদের কাছে বলল, 'হে প্রবাসীদল! আমাদের সর্দার সর্পদংশিত হয়েছেন, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও কোন উপকার হয় নি। আপনাদের মধ্যে কারো নিকটে কি কোন ব্যবস্থা আছে? সাহাবীগণের মধ্যে একজন (রাবী আবূ সাঈদ ﵁) বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি ইহার মন্ত্র জানি। কিন্তু (আল্লাহর কসম) আমরা তোমাদের

কাছে খাবারের নিমন্ত্রণ প্রার্থনা করেছিলাম; তোমরা সে নিমন্ত্রণ প্রদান করতে পারো নি। অতএব আমি মন্ত্রপাঠ করে তোমাদের উপকৃত করতে পারি এই শর্তে যে, উহার বিনিময়ে তোমরা কিছু পারিশ্রমিক আমাদেরকে প্রদান করবে।' অতঃপর তাদের সঙ্গে এক পাল (৩০টি) ছাগল পারিশ্রমিকরূপে দেবার কথা চুক্তিবদ্ধ হলো। তার পর সাহাবী (আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ) গেলেন এবং (সূরা ফাতিহার) 'আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' আয়াত ও অন্য আয়াতগুলি পড়তে লাগলেন ও দষ্টস্থানে তাঁর থুথু দিতে থাকলেন। ফলে সর্পদষ্ট সর্দার সুস্থ হয়ে উঠলেন। মনে হলো যেন তাঁর শক্ত বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি এমনভাবে চলে-ফিরে বেড়াতে লাগলেন, যেন মনে হচ্ছিল, তার কোনই কষ্ট নেই। খুশী মনে তখন তারা আপোষ-চুক্তি মুতাবিক সাহাবীবৃন্দের পারিশ্রমিক পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিল। এবারে সাহাবীগণ কেউ কেউ বললেন, 'উপঢৌকনে প্রাপ্ত ছাগলগুলি তাহলে আমাদের ভাগ-বন্টন করে নেয়া হোক।' এর উত্তরে যিনি মন্ত্রপাঠ করেছিলেন, তিনি বললেন, 'না তোমরা এখন এ রকমটি করো না - যতক্ষণ আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে হাজির না হয়েছি। তার সমীপে গিয়ে যা কিছু ঘটল সব কিছু উল্লেখ করব, তারপর আমরা দেখব - হুজুর ﷺ এ মর্মে কি নির্দেশ দিবেন।' এ কথাই স্থির করতঃ সাহাবীগণ নবী-দরবারে উপস্থিত হলেন এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর ﷺ ঘটনা শ্রবণ করতঃ বললেন, "তুমি কি করে জানলে যে, ওটি (সূরা ফাতিহা) একটি মন্ত্র বটে।?" তারপর তিনি নিজেই মন্তব্য করলেন যে, "তোমরা ঠিকই করেছ। তোমরা আপোষের মধ্যে ছাগলগুলি ভাগ-বন্টন করে নাও।" এবং হাঁসতে হাঁসতে বললেন যে, "আমার জন্যও একটা ভাগ রেখো।" *(বুখারী শরীফ ৩০৪ পৃঃ)*

অত্র হাদীসের ঘটনায় জানতে পারা গেল যে, সূরা ফাতিহা সর্পদংশনের ক্ষেত্রে মন্ত্রের কাজ দেয়। নবী করীম ﷺ উপরোক্ত ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহাকে মন্ত্ররূপে পাঠ করার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দান করেছেন। শরীয়ত সম্মত মন্ত্র পাঠে উপকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে উপহার বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও আপত্তিকর বিষয় নয়। নবী করীম ﷺ নিজের জন্যেও একটা অংশ লাগাতে বলেছিলেন। ইহা একমাত্র সাহাবীবৃন্দের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে। যাতে কোরে ঐ পারিতোষিক ব্যবহার করতে সাহাবীগণের কোন দ্বিধা-সংকোচ না থাকে।

নোট ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ বা অন্য কোন আয়াত পাঠ করতঃ দুআ বা মন্ত্রের কাজ সত্যি সত্যিই পাওয়া যেতে পারে। তজ্জন্য মন্ত্রপাঠকারীকে শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দী

সহকারে কিছু আমলও রাখতে হবে। ঠিকমত আমল রাখলে ইন শাআল্লাহ কাজ পাওয়া যাবে। অন্যথায় বিফল মনোরথ হতে হবে। অতএব [illegible] (আমলকারীগণ আমল করুক।)

প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিকরূপে ডাক্তারী বই থেকেও আরো কিছু কার্যকরী গার্হস্থ্য ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ব্যবস্থা অবলম্বনে তড়িঘড়ি বড় একটা উপকার পাওয়া যাবে - ইন শাআল্লাহ।

১। "সর্প দংশন করিবা মাত্রই দষ্টস্থানের কিছু উপরে দড়ি বা কাপড় দিয়া শক্ত তিনটি তাগা (একটির উপর একটি) বাঁধ; বাঁধন এমন হওয়া চাই যেন বন্ধনের নীচে রক্তের চলাচল না ঘটে। তারপর ছুরি বা অন্য কোন তীক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা যে যে স্থানে দাঁতের দাগ বসিয়াছে তাহার উপর দুই ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া দুই পার্শ্বে অঙ্গুলী দ্বারা অল্প টানিয়া ফাঁক কর। ঐ স্থানে বিষ থাকিলে তথা হইতে লাল জলের মত এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। (বেশী রক্তস্রাব হইলে দুই পার্শ্ব ধীরে ধীরে টিপিলেই রক্ত বন্ধ হইবে। তারপর এক গ্রেন আন্দাজ 'পার্মাঙ্গানেট অভ-পটাস' একটু জল বা থুথু দিয়া গুলিয়া দষ্টস্থানে উত্তমরূপে ঘষ; এই রকম কয়েক মিনিট ঘষিলেই সেই স্থানটি কালো হইয়া আসিবে। তারপর দংশনের উপর ভালরূপে কাপড় জড়াইয়া বাঁধন দাও; উপরের তাগা তিনটি খুলিয়া ফেল। রোগীকে এমনভাবে ঠেস দিয়া বসাইয়া রাখিতে হইবে, যেন সে ঘুমাইয়া না পড়ে। দংশনের অব্যবহিত পরই এই প্রকার চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বিত হইলে প্রাণ নাশের আশংকা প্রায় থাকে না। কিছু 'পার্মাঙ্গানেট অভ-পটাস' গৃহস্থ মাত্রেরই যেন ঘরে থাকে।"

২। "ক্ষতস্থানের উপর নুনের পুঁটলী করিয়া সেক দিলে বা (লবণ মিশ্রিত) গরম জল সেচন করিলে রক্ত বাহির হইতে থাকিবে। পরিষ্কার লালবর্ণ রক্ত বাহির না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বন্ধ করিবে না।"

৩। "জলপাইয়ের (যয়তুন) তৈল (Olive-Oil) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।" *(পারিবারিক চিকিৎসা ৩২ পৃঃ)*

উপরোক্ত ডাক্তারী বিবৃতি পাঠ করতঃ আশা করি পাঠকবর্গ হুজুর করীম ﷺ-এর প্রদর্শিত 'লবণ-জল' ব্যবস্থার গুরুত্ব বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

৪। রক্ত-দোষজনিত বাত-বেদনাদির চিকিৎসাঃ-

রক্তদোষ জনিত বাত-বেদনা ইত্যাদি নানা ধরণের ব্যাধি হয়ে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থান থেকে বদরক্ত টেনে বের করে দেয়াই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তাই সমস্ত হাদীস গ্রন্থে দেখা যায় যে, নবী করীম ﷺ নিজে দেহ থেকে মাঝে মাঝে দূষিত রক্ত টেনে বের করাতেন এবং তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতগণকেও তাদের দেহ থেকে বদ রক্ত টেনে বের করার পরামর্শ সূচক নির্দেশ দান করেছেন।

হযরত আবূ কাবশা ؓ হতে বর্ণিত যে, একদা রসূলুল্লাহ নিজের মস্তকে এবং দুই স্কন্ধের মধ্যখানের বদরক্ত সিঙ্গী দ্বারা টেনে বের করাচ্ছিলেন এবং মুখে বলছিলেন, "যে ব্যক্তি এই দূষিত রক্ত বের করে দেবে সে যদি আর কোন কিছুর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ না করে তবে তার কোন ক্ষতি হবে না।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৮৯পৃঃ)*

পুরাতন কালের সকল হেকীম ও ডাক্তারগণ এ কথা নিঃসংকোচে স্বীকার করেছেন যে, গরম আব-হাওয়ার দেশে রক্তদোষজনিত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেহ থেকে বদরক্ত বের করে দেওয়াই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কারণ ওদের রক্ত পাতলা হয় এবং তা শরীরের চর্ম আবরণের নীচে চলে আসে। অতএব তাকে সিঙ্গী দ্বারা টেনে বের করাই হচ্ছে - সহজ পদ্ধতি। *(মযাহেরে হক জদীদ ৪র্থ খন্ড ২৬ পৃঃ)*

আধুনিক কালের ডাক্তার, হেকীমগণ নিজেদের বই পুস্তকে ঐ ধরণের ব্যাধিগ্রস্তদের আক্রান্ত স্থানে জোঁক বসিয়ে ঐ রক্ত বের করার পরামর্শ দান করেছেন। আমরা যদি আধুনিক কালের এই পদ্ধতিকে নবীযুগের সিঙ্গী ব্যবহার পদ্ধতির বিকল্প একটা পদ্ধতি বলি - তবে তা মোটেই অত্যুক্তি হবে না।

নোট ঃ সিঙ্গী ব্যবহারের নিয়ম এই যে, প্রথমে আক্রান্ত স্থানে তীক্ষ্ণ ছুরী, নরুন ইত্যাদি দ্বারা একটু পেঁচে দিতে হবে, তারপর সেখানে একটা মুখ বড় ও একটা মুখ ছোট সিঙ্গী দ্বারা মুখের সাহায্যে রক্ত টানতে হবে। ইহাকে 'কুলহী-লাগানো' ও বলে। এটা অবশ্য সবার দ্বারা সম্ভব হয় না। এটা একটা বিশেষ কৌশল। নবী করীম ﷺ-এর যামানায় যাঁরা এই কৌশল জানতেন, তাঁদের দ্বারাই ঐ কাজ নেওয়া হতো এবং তাঁদের এই কাজের পারিশ্রমিকও দেওয়া হতো।

৫। রক্তপাত বন্ধ করার উপায় ঃ-

আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনো কখনো ছুরী ইত্যাদিতে কেটে যাওয়ার ফলে কিম্বা পাথর ইত্যাদিতে চোট লেগে সেখান থেকে রক্তপাত ঘটে। এই রক্তপাত বন্ধ করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আশু প্রয়োজন। আর রক্ত বন্ধ করার নানা উপায়, নানা পদ্ধতি মানুষ অবলম্বন করে থাকে। নবী করীম ﷺ-এর যুগে জখম হতে রক্তপাত

বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং পচন নিবারণ মানসে 'ছাই'ও ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ ঘোরতর আহত হয়েছিলেন। নবী কন্যা হযরত ফাতিমা রাঃ যখন দেখলেন যে, হুযুরের ক্ষতস্থানে পানি ঢালাতে রক্তপাত বেশী হচ্ছে তখন তিনি খেজুর পাতার চাটাই এর একটা টুকরো পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ইহাতে রক্তপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। *(বুখারী ৫৮৪ পৃঃ)*

ভস্ম বা ছাই গৃহস্থ ব্যক্তিদের কাছে খুব সহজপ্রাপ্য জিনিস। কিন্তু ইহার কার্যকারিতা নেহাৎ কম নয়। টাটকা জখমের উপর লাগালে দু রকম কাজ পাওয়া যায়, রক্তপাত বন্ধ করা এবং এন্টিসেপটিক বা পচন নিবারণ করা। আজকের সভ্য জগতেও গুঁড়ো কাঠ কয়লা, ছাই বা ভস্মের ব্যবহার খুব প্রশংসার সঙ্গেই (ক্ষেত্র বিশেষ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্ষতস্থানে খদির বা খয়ের গুঁড়ো অথবা বরফ লাগালেও রক্তপাত বন্ধ হয়। আর কবিরাজী মতে আমাদের সকলের জানা 'দূর্ব্বা ঘাস' দাঁতে চিবিয়ে কিম্বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় থেতো করে জখমে লাগালে ছাই-এর মতই রোধক ও পচন নিবারকের কাজ করে থাকে।

কিন্তু শিরা কেটে রক্তপাত হলে তা বন্ধ করা খুব সহজ নয়। আর বন্ধ না করলেও ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা। এ রকম পরিস্থিতিতে ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন। ডাক্তার আগমনের আগে পর্যন্ত গার্হস্থ্য পদ্ধতিতে ব্যান্ডেজ করে নিলেও বিপদের আশংকা কেটে যাবে যাবে - ইনশাআল্লাহ।

যখন দেখা যাবে যে, ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কী দিয়ে লাল অথবা কালচে রক্ত আসছে তখন বুঝতে হবে শিরা বা ধমনী টেকে রক্ত আসছে। এ ক্ষেত্রে মোটা সুতো, পাড়, ফিতা ইত্যাদি দ্বারা জখমের উপরে ও নীচে বেশ শক্ত করে, বেশ একটু আঁট-সাঁট করে বেঁধে দিতে হবে। ইহাই আমাদের 'গার্হস্থ ব্যান্ডেজ'। ব্যান্ডেজ বাঁধার পর ছাই, দূর্ব্বা ঘাস ইতাদি লাগিয়ে দিতে হবে।

চিনি বা গন্ধকচূর্ণ আহতস্থানে বেঁধে রাখলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও কাটা ঘা জুড়ে যায়। 'জার্মানীর ডাক্তারগণ বিগত ইউরোপীয় সমরে আহত সৈনিকগণের ক্ষতে চিনি প্রয়োগ করিয়া ক্ষত ভাল করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতেছে। প্রয়োগ প্রণালী অত্যন্ত সহজ। দানাময় চিনির দ্বারা ক্ষত ড্রেস করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়।' *(পারিবারিক- ৭১৩ পৃঃ)*

প্রসঙ্গতঃ কারণে পাঠকদের হিতার্থে 'মচকানো' ও কালশিরা পড়া ও আগুনে পোড়ার গার্হস্থ্ ব্যবস্থা লিখে হেকিমী চিকিৎসারও উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

৬। মচ্কানো ঃ-

রবারের মত যে রজ্জুদ্বারা মনিবন্ধ গুলফাদিগ্রন্থি বাঁধা থাকে আঘাত লাগা হেতু সেই রজ্জু ছিন্ন হয়ে যায়। ইহাকেই মুচ্কে যাওয়া বলে। আহত স্থান বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয়। মচ্কানো অঙ্গটি নাড়াচাড়া কম করতে হবে এবং আহত স্থানে চুন-হলুদ লাগাতে হবে - অর্থাৎ, অল্প গুঁড়ো হলুদ + একটু চুন + একটু লবণ (বা একটু সোরা) একত্রে মিশিয়ে আঁচে গরম করতঃ একটু গরম থাকতেই মচ্কানো অঙ্গে লাগাতে হবে। দিনে দু-তিনবার গরম চুন-হলুদ লাগালে ফুলো ও বেদনা উপশম হয়।

৭। কালশিরা পড়া ঃ-

কখনো কখনো আহত স্থান হতে রক্তপাত হয় না; কিন্তু স্থানটি নীলবর্ণ দেখায়। ইহাকেই 'কালশিরা পড়া' বলে। কালশিরা পড়লে বাইরে রক্ত পড়ে না; কিন্তু আহত স্থান মধ্যস্থ সূক্ষ্ম রক্তবহা নালীসমূহ ছিঁড়ে রক্ত পরে ও রক্তটুকু ভিতরেই থেকে যায়। তাই আহত স্থানটি নীলবর্ণ দেখায়। কালশিরা পড়া স্থানটি খানিকক্ষণ ঠান্ডা-শীতল জলে ধুয়ে দিতে হবে। তারপর গরম জলের সেক দিলে বেদনা ও ফুলা কমে যাবে - ইনশাআল্লাহ।

৮। আগুনে পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসা ঃ-

আগুনে কিম্বা গরম পানিতে কোন অঙ্গ দগ্ধ হলে, সে স্থানের চামড়া উঠাতে হয় না। দগ্ধ স্থানে যেন বায়ু না লাগে। তাই অল্প বা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হওয়া মাত্র (ও চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত) সামান্য পরিমাণ তেল (সরিষা, নারিকেল, তিল অথবা মসিনার তেল) চুন মিশ্রিত করে দগ্ধ স্থানে লাগাতে হবে। তেল ও চুন অভাবে কেবল ময়দা, আটা, কিম্বা এরারুট ছিটিয়ে রাখতে হবে।

ডাক্তার ব্যাম্বার্জার বলেন যে, কাপড় কাচা সোডা জল মাখিয়ে দগ্ধ স্থানে আস্তে আস্তে ঘসলে যন্ত্রণা অবিলম্বে নিবারিত হয়। কিন্তু পোড়া যদি গভীর বা শরীরের অনেকটা স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহলে সোডার জলপটি (নয় ভাগ জল ও এক ভাগ সোডা) দগ্ধ স্থানে লাগাতে হবে। *(The Indian Medical Record,*

January 1915 Page 17)

কতিপয় হেকিমী চিকিৎসার বিবরণ

সাধারণ গৃহস্থ, পল্লীবাসী ভাই ও বোনেদের হিতার্থে আরো কতিপয় সহজসাধ্য চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা হলো; যেগুলি হেকীমগণের পরীক্ষিত বলে স্বীকৃত হয়েছে ঃ-

৯। নাক দিয়ে রক্ত পড়া ঃ-

কর্পূর চূর্ণ করতঃ টাটকা ধনে পাতার রসের সঙ্গে মিশ্রিত করে কপালে মালিশ করলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

১০। শিরঃপীড়া ঃ-

সাড়ে চার মা-শা পরিমাণ (অর্দ্ধ তোলা থেকে একটু কম) কাবাবচিনি, দুই তোলা পরিমাণ মূলোর নিংড়ানো পানিতে মিশ্রিত করে সেবন করলে পুরাতন মাথা ধরা রোগে খুবই উপকারী। প্রত্যহ একবার করে সপ্তাহ খানেক ব্যবহার করা উচিত। ইহা ব্যবহারে যকৃৎ ও প্লীহা রোগেও যখন চোখ-মুখ হলদে হয়ে যায়, তখন খুবই উপকার করে।

১১। স্বরভঙ্গ ঃ-

কাবাবচিনি নয় মাশা (এক তোলা থেকে একটু কম) দু-ছটাক পানিতে ফেলে ভালভাবে আগুনে জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। অতঃপর সেই পানি ছেঁকে একটু মিছরী মিশ্রিত করে সেবন করলে গলার স্বরভঙ্গ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। গলার স্বর পরিষ্কার হবে এবং গলার মধ্যে কফ-শ্লেষ্মা জমে থাকলে ইহা তা দূর করে দেবে।

১২। উদরাময় ঃ-

দেড় তোলা পরিমাণ 'আনজির' বা পিয়ারা পাতা অথবা ডুমুর পাতা পানিসহ পেষণ করতঃ একটু ছেঁকে নিয়ে সেবন করলে সব রকমের পাতলা পায়খানা ব্যাধিতে খুবই উপকার করে।

পাতলা পায়খানার সঙ্গে সাদা আম (মিউকাস) থাকলে 'শ্বেতচন্দন' এবং রক্ত মিশ্রিত থাকলে 'রক্তচন্দন' পরিমাণমত পিষে শরবত আকারে সেবন করলে বিশেষ উপকার দর্শে।

২/৩টি জামের আঁটি থেঁথো করে বা গুঁড়ো করে মিছরীর শরবতসহ ২/৪ বার

সেবন করলেও উদরাময় রোগে খুব ভাল কাজ করে। এ মর্মে 'পোস্তদানা'-এর শরবতও হেকিমীগণের নিকটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা।

১৩। জখম বা ঘা ঃ-

কুল বা বরের পাতা থেকে রস নিংড়ে বের করতঃ সেই রস আগুনে জ্বাল দিতে দিতে যখন গাঢ় হয়ে যাবে, তখন টাটকা ঘা বা জখমে লাগালে খুব শীঘ্র ঘা সেরে উঠে।

১৪। মাসিক-স্রাব দোষ ঃ-

রাত্রে ২ তোলা তিল, ২ তোলা বুট একত্রে ১ পোয়া আন্দাজ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে একটু হালকা আঁচে গরম করে ছেঁকে নিয়ে সেবন করলে মাসিকের দোষ কেটে যায়। যাদের মাসিক হয় না অথবা কম হয় তাদের ক্ষেত্রে পর পর বেশ কয়েক দিন ব্যবহার করলে মাসিক বেশ খোলাসা ভাবে হয়।

১৫। বন্ধ্যত্ব ঃ-

নিম্নের কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণীয় ঃ-

১। খাঁটি কস্তুরী মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে পুরুষাঙ্গে মালিশ করতঃ খানিকক্ষণ পর স্ত্রী-সহবাস করবে।

২। বটবৃক্ষের তাজা নামাল (জট বা ঝুরি) শুকিয়ে পেষণ করতঃ পরিমাণমত গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাসিকস্রাব অন্তে দুধসহ সকালে স্ত্রী সেবন করবে।

৩। খাঁটি কস্তুরী ও খাঁটি জাফরান চূর্ণ করতঃ মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে ছোট আকারের সলতে তৈরী করবে। অতঃপর সেই সলতে দুগ্ধে ডুবিয়ে যোনীপথে ৫/৭ দিন ব্যবহার করবে।

৪- স্বামী সহবাসের পর সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ না করে বেশ কিছুক্ষণ স্ত্রীকে শুয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। পর পর তিন মাস যাবৎ উপরোক্ত নিয়ম পালন করলে ইনশাআল্লাহ গর্ভধারণ হতে পারে।

১৬। দন্ত রোগ ঃ-

১- আদাকে পাতলা করে কেটে তাতে একটু লবণ ছিটিয়ে আগুনে গরম করতঃ ব্যথার জায়গায় ধারণ করলে দাঁতের ব্যথা ও মাঢ়ী ফোলা দূরীভূত হয়।

২- বাবলা গাছের ছাল টুকরো টুকরো করে কেটে প্রয়োজন মত পানিতে ফেলে গরম আঁচে ফুটিয়ে নিয়ে কুল্লী করলে দাঁতের পোকা বের হয়ে যায়।

১৭- শুষ্ক কাশি ঃ-

তাজা মাখন মিছরীসহ ভক্ষণ করলে খুসখুসে কাশি আরাম পড়ে।

১৮। অর্শ ঃ-

মাঝারি আকারের একটি মূলো যার গায়ে শিকড় থাকে না এবং সুস্বাদু তাকে ২ তোলা মিছরীর সাথে মিশিয়ে প্রত্যহ ২১ দিন যাবৎ খেলে অর্শের রক্ত চিরতরে বন্ধ হয়।

১৯। ক্ষুধামন্দ ঃ-

গন্ধক, শুঁঠ ও লবণ সমপরিমাণ একত্রে চূর্ণ করতঃ প্রয়োজনমত লেবুর রসে মিশিয়ে বনকুলের আঁটির সমান গুলি প্রস্তুত করে প্রত্যহ খাবার পর পর ১টি করে সেবন করলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ক্ষুধামন্দ দূর হয়।

২০। কাশি ও হাঁপানী ঃ-

রাত্রে শোবার সময় ৮/৯টা লবঙ্গ একটা একটা করে চিবিয়ে খেলে কাশি ও হাঁপানী আরাম পড়ে।

২১। মাথা ধরা ঃ-

৪/৫ টা লবঙ্গ পানিসহ পিষে কপালে লাগালে মাথা ব্যথার আশু উপশম হয়।

২২। বমনেচ্ছা ঃ-

যে কোন কারণে বমি বমি ভাব হলে কয়েকটি লবঙ্গ মুখে রাখলে বমি ভাব কেটে যায়।

২৩। চুলকানি ও দাদ ঃ-

গাইগরুর গোবর মোটা কাপড়ে রেখে রস নিংড়ে বের করে নিতে হবে। ঐ রস এক তোলা এবং কেরোসিন তেল এক তোলা একত্রে মিশিয়ে লাগালে খুব পুরাতণ দাদও এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। ঔষধ লাগাবার আগে তামার পয়সা দিয়ে আক্রান্ত স্থানটি রগড়ে দিতে হবে।

২৪। প্রসব ব্যথা ঃ-

পল্লীগ্রামে প্রসব ব্যথা একটা জীবন-মরণ সমস্যা। সুপ্রসবের জন্য অনেক ঔষধও

ব্যবস্থা করা হয়। তবে নিম্নের ব্যবস্থাটা অব্যর্থ ব্যবস্থা। হেকীমগণ একে ধন্বন্তরি ব্যবস্থা বলেছেন। আর সে ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে ঘোড়ার 'খুর' কয়লার আগুনে রেখে তার ধুনো (ধুঁয়ো) আসন্ন প্রসবা নারীর নাকে দেওয়া। ইহাতে খুব সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহা আল্লাহর একটি আশ্চর্য কুদরত। যেখানে ঘোড়ার পায়ে 'নাল' লাগানো হয়, সেখানে ঐ খুর সহয়ে পাওয়া যায়। কিম্বা যে কোন উপায়ে ইহা সংগ্রহ করে রাখা ভাল।

তেজপত্রের ধুনো (ধুঁয়ো) দিলে কষ্টকর প্রসব ব্যথায় আরাম পাওয়া যায়। আপাং বা চড়চড়ে গাছের শিকড় বাম উরুতে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখলে সহজে প্রসব হয়। প্রসব হলে খুলে দিতে হয়।

২৫। পেট ফাঁপা ঃ-

লবঙ্গচূর্ণ ১০ রতি (গ্রেন) ৫ তোলা ফুটন্ত পানিতে ফেলে অর্দ্ধঘন্টা পর একটি বোতলে ছেঁকে ভরে রাখতে হবে। অতঃপর উহা ২ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ দু-বার দিন কয়েক সেবন করলে পেটফাঁপা রোগ উপশম হবে।

২৬। প্রস্রাব ব্যাধি ঃ-

অনেকের বার্দ্ধক্য অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ অনেক সময় ঘন-ঘন প্রস্রাব হয়। তাই কষ্টকর ব্যাধি নিবারণের জন্য মূল্যবান ঔষধ হচ্ছে জামের আঁঠি। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সিকি তোলা পরিমাণ জামের আঁঠি চূর্ণ একটু ঠান্ডা পানি সহ সেবন করলে বিশেষ উপকার দর্শে।

২৭। ধাতের ব্যারাম ঃ-

কোন কোন রমণীর সাদা রঙের লালাস্রাব যোনীপথ দিয়ে নির্গত হয়ে অজ্ঞাতে তার কাপড়ে লেগে যায়। এ ক্ষেত্রে 'জৈত্রী' বলে একটি দ্রব্য বাজারে জড়ি-বটীর দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। তিন-চার দিন ঐ জৈত্রী পানের সঙ্গে একটি করে প্রত্যহ ৩/৪ বার খেলে ইনশাআল্লাহ আরাম হয়ে যায়।

২৮। সর্বপ্রকার জ্বর ঃ-

লতা জাতীয় এক প্রসিদ্ধ গাছড়ার নাম 'গুলঞ্চ'। এই গুলঞ্চ ১ তোলা পরিমাণ টুকরো টুকরো করে কেটে ২ ছটাক আন্দাজ পানিতে সন্ধ্যারাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকাল বেলায় ছেঁকে সেবন করতে হবে। সপ্তাহখানেক সেবন করলে সর্দি জ্বর,

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জ্বর নাশ করতে চমৎকার উপকার করে।

২৯। ধাতু দুর্বলতা ঃ-

ছোট এলাচ, বড় এলাচ, অশ্বগন্ধা ও তালমাখানা সব কয়টি সমপরিমাণ একত্রে পেষণ করতঃ ভালভাবে চূর্ণ করে নিতে হবে। অতঃপর ঐগুলির সমতুল্য মিছরী গুঁড়ো মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে এক তোলা পরিমাণ এক পোয়া আন্দাজ খাঁটি গো-দুগ্ধসহ সেব্য। ইহা লাগাতার ১০/ ১৫ দিন সেবন করলে দাতু দুর্বলতা দোষ কেটে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

তৃতীয় অধ্যায়

ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা

স্বাস্থ্যবিধিসমূহ পালন করার মাধ্যমে এবং ঔষধ সুপথ্য গ্রহণের দ্বারা ইসলাম যেমন রোগ নিরাময়ের পরামর্শ দান করেছে তেমনি বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দুআ বা মন্ত্র পাঠের সাহায্যেও রোগ সারানোর অনুমতি দান করেছে। যেসব ক্ষেত্রে ঔষধ-পথ্য কোন উপকার দর্শে না, বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে ঝাড়- ফুঁকের দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই; বরং ঐসব ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় বা বেশী উপযোগী।

তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ও লক্ষনীয় কথা হচ্ছে, দুআ বা মন্ত্রের বাক্য যেন শরীয়ত গর্হিত কোন কথা না থাকে। যেমন, যাদু-মন্ত্র, শির্কমূলক বাক্য, জ্যোতিষ শাস্ত্রের নির্দেশমত শরীয়ত-নিষিদ্ধ তিথি ও ক্ষণ পালন ইত্যাদি। এগুলিকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় নি; বরং এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম বলে বিঘোষিত হয়েছে। নিম্নের হাদীসটি প্রনিধান করুন ঃ

হযরত আউফ বিন মালিক ﷺ বলেন যে, আমরা প্রাক্ ঐসলামিক যুগে মন্ত্রাদি পাঠ করতাম। তাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ঐসব মন্ত্রের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?'

হুযুর ﷺ বললেন, 'তোমাদের মন্ত্রগুলি আমার কাছে পেশ করো। যতক্ষণ ঐগুলিতে শির্কমূলক কোন বাক্য থাকবে না, ততক্ষণ সেগুলির ব্যবহারে আমার আপত্তি নেই।' *(মুসলিম, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

অতএব যে দুআ বা মন্ত্রে দেব-দেবী, জিন-ভূত, অথবা কোন পীর-ওলীর নাম কিম্বা তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মত কোন বাক্য থাকবে না, সে সব মন্ত্র পাঠে কোন দোষ নেই। আবার যেসব মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য নয়, সেই সব মন্ত্র পাঠ থেকেও তফাতে থাকা দরকার। কারণ, সে গুলোতে হয়ত নিষিদ্ধ কোন ব্যাপার থাকতে পারে- এই আশংকায়।

পক্ষান্তরে যে সব মন্ত্রে নিষিদ্ধ কোন বাক্য থাকবে না, সে গুলি ব্যবহার করতে কোন বারণ নেই। নিম্নের দু'টি হাদীসে তার প্রমাণ রয়েছে ঃ

১। জননী আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বদ-নজরের কুফল দূর করনার্থে মন্ত্রপাঠ করতঃ ঝাড়-ফুঁক করতে নির্দেশ দান করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

২। হযরত আনাস ﷺ বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ নজর-দোষ, বিষাক্ত জন্তুর দংশন এবং দূষিত ঘা সারাবার নিমিত্তে ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দান করেছেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধিতে দুআ ও মন্ত্রপাঠের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাধি অপেক্ষা উপরোক্ত তিনটি ব্যাধির ক্ষেত্রে মন্ত্রপাঠ বেশী ক্রিয়াশীল এবং মন্ত্রপাঠের সুফল বেশী পরিলক্ষিত হয় বলে হাদীসে তিনটির উল্লেখ নির্দিষ্ট হয়েছে।

সর্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র কি?

সব থেকে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য দুআ ও মন্ত্র হচ্ছে কুরআন হাকীমের আয়াতসমূহ। ইহার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক বরকত ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি সূরা ও নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ঝাড়-ফুঁকের জন্য বিশেষ উপকারী ও উল্লেখযোগ্য। যেমন সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা

না-স, আয়াতুল কুরসী এবং ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলিতে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এরপর হাদীস গ্রন্থে যে সমস্ত দুআ নবী করীম ﷺ থেকে রোগমুক্তির জন্য জানা গেছে সে গুলিও উত্তম দুআ বা মন্ত্ররূপে ব্যবহার্য্য।

সর্বরোগ আরোগ্য-এর সূরা ঃ-

সর্বপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর জন্য সূরা ফাতিহা একটি অন্যতম সূরা। এই সূরা বেশ কয়েকটি নাম হাদীস ও তফসীর গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে, 'সূরাতুশ্ শিফা' অর্থাৎ, রোগ নিরাময়ের সূরা। নবী করীম ﷺ-এর ফরমান প্রনিধান করুন [illegible] অর্থাৎ, ওটি প্রত্যেক রোগের জন্য আরোগ্য দানকারী সূরা। *(তফসীর বাইযাবী ৩ পৃঃ)*

সর্পদংশনের মন্ত্ররূপে সূরা ফাতিহা বিশেষ কৃত-কার্যতার সঙ্গে সাহাবীগণ ব্যবহার করেছেন এবং তাতে অত্যাশ্চর্য ফলও লক্ষ্য করেছেন। এ মর্মে বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্তে পাঠকবর্গকে এই পুস্তকের 'সর্প-দংশনের চিকিৎসা' প্রসঙ্গটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

সর্প ও বিচ্ছু দংশনের ক্ষেত্র ছাড়াও সাহাবীগণ ঐ সূরাটিকে মৃগী রোগগ্রস্ত ও মস্তিষ্ক-বিকৃত ব্যক্তির উপরও পড়ে ফুঁক দিতেন এবং তাতে তাঁরা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হতেন, আর নবী করীম ﷺ সাহাবীদের ঐ সব ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিও দান করেন। *(মযাহেরে হক জাদীদ ২য় খন্ড, কিস্তি নং ৬, পৃঃ নং৫৫)*

সর্বরোগ আরোগ্যের কতিপয় আয়াত

হাদীস থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। ঘটনাটি এই ঃ-

হযরত শায়খ আবুল কাসেম কুশাইরী (রহঃ) বলেন, 'একদা আমার একটি ছেলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি আমরা তার জীবন নৈরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। এমতাবস্থায় আমি একদিন হযরত রসূলে করীম ﷺ-কে স্বপ্নযোগে দর্শন করলাম এবং তাঁর খিদমতে আমার ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে আরয করলাম। শুনে হুযুর ﷺ বললেন, "তুমি 'কুরআনের আয়াতে-শিফা' (রোগমুক্তির আয়াত) থেকে বে খবর রয়েছ কেন ?"

এই স্বপ্ন দর্শন করার পর আমি 'কুরআনের আয়াতে-শিফাগুলির অনুসন্ধান করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি নিম্নোক্ত ৬টি আয়াতের সন্ধান পেলাম। যথা ঃ-

১। "অয়্যাশফি সুদূরা কাউমিম মু'মিনীন।" *(সূরা তাওবাহ ১৪ আয়াত)*

(([illegible]))

২। "অশিফাউল লিমা ফিস সুদূর।" *(সূরা ইউনুস ৫৭ আয়াত)*

(([illegible]))

৩। "য়্যাখরুজু মিম বুতুনিহা শারা-বুম মুখতালিফুন আলওয়ানুহু ফীহি শিফাউল লিন্না-স।" *(সূরা নাহল ৬৯ আয়াত)*

(([illegible]))

৪। "অনুনাযযিলু মিনাল কুরআ-নি মা হুয়া শিফাউ অরাহ্মাতুল লিল মুমিনীন।" *(সূরা বনী ইসরাঈল ৮২ আয়াত)*

(([illegible]))

৫। "অইযা মারিযতু ফাহুআ য়্যাশফীন।" *(সূরা শুআরা ৮০ আয়াত)*

(([illegible]))

৬। "কুল হুআ লিল্লাযীনা আ-মানূ হুদাউঁ অশিফা।" *(সূরা হা-মীম ৪৪ আয়াত)*

(([illegible]))

অতঃপর আমি উপরোক্ত আয়াতগুলি একটি পাত্রে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করতঃ পীড়িত ছেলেটিকে পান করালাম। ইহাতে ছেলেটি এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠল যে, মনে হলো - যেন ওর পায়ে কোন শক্ত বন্ধন ছিল, এক্ষণে সে বন্ধনটি খুলে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামাহ কাযী বাইযাবী (রঃ) তাঁর বিশ্ব-বিশ্রুত তফসীর গ্রন্থেও উপরোক্ত আয়াতে শিফাগুলির উল্লেখ করেছেন। আবার তফসীরে বাইযাবীর হাশিয়ায় (টীকা) আল্লামা সা'দ চিল্পী (রহঃ)ও আয়াতগুলি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি আবুল কাসেম কুশাইরী (রহঃ) এর উপরোক্ত ঘটনারও বিবৃতি দান করেছেন।

হযরত শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ)-এর একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি বলেছেন, 'আমি আমার অনেক বুযুর্গদেরকে দেখেছি তাঁরা উপরোক্ত আয়াতে কারীমাগুলি নানা প্রকার রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে লিখতেন।' *(মযাহেরে হক জাদীদ ৪র্থ, ১ম খন্ড কিস্তি ১৯পৃঃ)*

দুআ লিখে হাতে-গলায় লটকানো শুদ্ধ নয়

দুআ-মন্ত্র লিখে ধৌত করে সেই পানি পান করা অথবা মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা অবৈধ নয়; বরং হাদীস সম্মত জিনিষ। কিন্তু লিখে তাবীয করে হাতে অথবা গলায় লটকানো ঠিক নয়। এ মর্মে একটি হাদীস লক্ষ্য করুন ঃ-

আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ ﷺ-এর সহধর্মিনী হযরত যয়নাব (রাঃ) বলেন, একদা আমার গলায় সুতো লটকানো দেখে আব্দুল্লাহ বলেছিলেন যে, তোমার গলায় এটা কি? আমি বললাম, 'এটা একটি সুতো, এতে মন্ত্র পাঠ করা হয়েছে।' ইহা শুনে আব্দুল্লাহ সুতোটিকে ধরে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহর পরিবার শির্ক থেকে এ যাবৎ বিরত আছে, আর তোমার এটা কি? এটা যে শির্কের পর্যায়ভুক্ত! আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট স্বকর্ণে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেছেন "নিষিদ্ধ দুআ-মন্ত্র, হাতে-গলায় তাবীয লটকানো এবং যাদু মন্ত্র এ সবই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। *(আবু দাউদ, মিশকাত ৩৮৯ পৃঃ)* [৫]

---

[৫] আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "কবজ, বালা, নোয়া ইত্যাদি ব্যবহারে লাভ তো কিছুই হয় না বরং ক্ষতিই হয়।" (আহমাদ ৪৪৫, ইবনে মাজাহ ৩৫৩১) যে সমস্ত তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অথবা কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে বানানো হয়, তা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

অবশ্য কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। যাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে। আশ্চর্যের কথা যে, ওদের মতে তাবীয বেঁধে মড়াঘর বা আঁতুড়ঘর গেলে তাবীয ছুত হয়ে যায়। কিন্তু অচ্ছুতের গায়ে ঐ তাবীয কি করে ছুত না হয়ে থাকে?

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অকুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

সর্বরোগ নিরাময়ের দুআ

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ رضي الله عنه নিজের সহধর্মিনীকে উপরোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করানোর পর শেষে বলেছিলেন, অসুখ ও পীড়ার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সাহায্য না নিয়ে হাতে গলায় তাবীয না লটকিয়ে এবং কোন প্রকার যাদু-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করে নিম্নের দুআটিই তোমার জন্য যথেষ্ট - যে দুআটি নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পড়তেন।

[illegible]

উচ্চারণ ঃ- আযহিবিল বা'স, রাব্বান্না-স, অশ্‌ফি আন্তাশ শা-ফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফা-উকা শিফাআল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ ঃ- হে সকল মানুষের প্রতিপালক! অসুখের কষ্ট দূরীভূত করে দাও, তুমি রোগ নিরাময় করে দাও, তুমিই রোগ মুক্তিদাতা, তোমার রোগমুক্তি ছাড়া কোনই রোগমুক্তি নেই। এমন রোগমুক্তি দান করো, যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে। *(আবু দাঊদ, মিশকাত পৃঃ ঐ)*

নোটঃ- রোগ-ব্যাধি দূর করবার শক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। অতএব যদি কেউ ধারণা করে যে, লোহা কিম্বা তামার এই বালাটি আমার রোগ সারিয়েছে অথবা হাতে-গলায় যে তাবীয লটকানো হয়েছে এটা আমার ব্যাধি দূর করেছে -তবে নিঃসন্দেহে এটি শির্ক বলে পরিগণিত হবে। ব্যাধি নিরাময় উদ্দেশ্যে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা শরীয়ত সম্মত দুআ মন্ত্র পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করার সময়

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এ ধরনের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। (ইবনে বায ২/৩৮৪)

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

প্রকাশ থাকে যে, যা ব্যবহার করা হারাম তা ক্রয় করা, লিখা, প্রচার করা, তাতে অর্থ উপার্জন করা এবং তার ব্যবসা করাও হারাম।

আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলি আমাদের অসুখ সারানোর জন্য একটা ক্ষুদ্রতম অবলম্বন ও সহায়তাস্বরূপ; প্রকৃত আরোগ্যদাতা মহান প্রভু। ঐ সব ব্যবস্থার সহায়তায় তিনি আমাদের আরোগ্য দান করবেন।

হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ আছে। যখন রোগের সঠিক ওষুধ নিরূপিত হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে সে রোগটি সেরে উঠে।" *(মুসলিম, মিশকাত ৩৮৭ পৃঃ)*

উপরে যে দুআটি সর্বরোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে পড়বার কথা বলা হয়েছে, ঐ দুআটি পড়ার সময় হুযুর করীম ﷺ রুগীর কপালে তাঁর ডান হাত ফিরাতেন। অন্য একটি সহীহ হাদীসে ইহার প্রমাণ রয়েছে। *(মিশকাত ১৩৪ পৃঃ)*

নজর দোষ কাকে বলে ও তার প্রতিকার কি?

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল-আইনু হাক্কুন" অর্থাৎ নজর দোষ একটি বাস্তব সত্য জিনিষ। যদি কোন জিনিষ অদৃষ্টের লিখন খন্ডন করতে পারত, তবে নজরদোষ তা খন্ডন করতে পারত। যখন (নজরদোষ হেতু) তোমাদেরকে কোন অঙ্গ ধৌত করার জন্য বলা হবে, তখন তোমরা তা ধৌত করে দাও।" *(মুসলিম, মিশকাত ৩৮৮ পৃঃ)*

নজর দোষের প্রভাববশতঃ মানুষ, পশু, ধন-সম্পত্তি বাগান-ক্ষেত ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দুনিয়ার তাবৎ জিনিষ আল্লাহর মীমাংসায় সংঘটিত হয়। আল্লাহর মীমাংসাকৃত কোন বিষয়ই খন্ডন করার কোন উপায় নেই। কিন্তু বদ-নজর এমন মারাত্মক জিনিষ যে, যদি কোন জিনিষে উক্ত বিষয় খন্ডন করার মত কোন শক্তি থাকত, তাহলে বদ-নজরে তা থাকত। অর্থাৎ, বদ-নজর একটা বাস্তব সত্য জিনিষ। এর কবলে পড়লে নজরদোষগ্রস্ত ব্যাক্তি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। ঔষধ-পথ্যের মাধ্যমে এর কোন প্রতিকার ব্যাবস্থা নেই। কাজেই ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করলেও কোন উপকার দর্শে না। এর থেকে আরোগ্য লাভের একটাই ব্যবস্থা আছে। আর সে ব্যবস্থা হচ্ছে, দুআ বা মন্ত্র পাঠ করতঃ ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থা। এই অবস্থায় আল্লাহানুগ্রহে মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নজরদোষ কাটাবার নিমিত্তে একটি পদ্ধতির উল্লেখ এসেছে। ঐ সময়ে আরবের প্রথা ছিল যে, যখন কারো উপর

বদ-নজর হতো তখন যার নজর লেগেছে তার দুই হাত, দুই পা এবং নাভীর তলদেশ ধৌত করতঃ সেই পানি দ্বারা বদ-নজরগ্রস্ত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হতো। আর এই পদ্ধতিকে তার দোষমুক্তির একটা উপায় মনে করত। নবী ﷺ এই পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দান করতঃ বলেছেন যে, "যার বদ-নজর লেগেছে তাকে যদি হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ ধৌত করার জন্য বলা হয়, তবে সে যেন তাতে আপত্তি না করে; বরং সে যেন অঙ্গ ধৌত করা পানি নজরদোষগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিয়ে উপকৃত করে।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিস্তৃত ঘটনা অন্য এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। পাঠকদের উপকারার্থে নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করলাম।

একদা আমের বিন রাবিয়াহ সহল বিন হুনাইফকে গোসল করতে দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে পড়লেন এবং মুখে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর কসম! সহলের মত অত সুন্দর রূপ-লাবণ্য আর কখনো দেখি নি। এমন কি অন্দর মহলে অবস্থানরতা কোন রূপসী নারীর ত্বক (চর্ম) ও অত সুন্দর আজ পর্যন্ত দেখতে পাই নি।'

আমেরের এ কথা বলাও ছিল আর অমনি সহল জমির উপরে টলে পড়ে গেলেন। অর্থাৎ, এমনভাবে বদ-নজর লাগল যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে ভূপতিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর সহলকে উঠিয়ে হুযুর ﷺ-এর সমীপে ধরাধরি করে আনা হলো এবং অনুরোধ করে বলা হলো, 'হে আল্লাহর রসূল! এঁকে সারানো যায় কি করে? আল্লাহর কসম, ইনি যে মাথা তুলতেও সক্ষম নন।'

সহলের অবস্থা দেখে হুযুর ﷺ বললেন, "কারো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে কি যে, তার বদ নজর এর প্রতি লেগেছে?"

লোকেরা বলল, 'জী হ্যাঁ! আমাদের ধারণা হচ্ছে যে আমের বিন রাবীআর বদ-নজর এঁকে আক্রান্ত করেছে।' ইহা শ্রবণ করতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কড়া-মিঠে স্বরে বললেন, "তোমরা তোমাদের কোন ভাইকে মারবার তালে কেন থাকো? তুমি সহলের রূপ-লাবণ্য দেখে যখন অভিভূত হয়েছিলে, তখন তুমি ওকে বরকতের দুআ দাওনি কেন? অর্থাৎ, 'বা-রাকাল্লাহু ফীক' (তোমার প্রতি আল্লাহ বরকত দান করেন) বাক্য কেন পাঠ করো নাই? তাহলে ওর উপর বদ-নজর লাগত না।"

অতঃপর হুযুর ﷺ আমেরকে নির্দেশ দিলেন, "তুমি সহলের জন্য তোমার অঙ্গগুলি ধুয়ে ঐ পানি ওর উপরে বহে দাও।" এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে আমের ﵁

একটি পাত্রে নিজের মুখমন্ডল, হাত, কনুই, হাঁটু, দুই পা ও পায়ের আঙ্গুলগুলি এবং নাভীর তলদেশ (লজ্জাস্থান) প্রভৃতি অঙ্গগুলি ধুয়ে দিলেন। অতঃপর সেই পানি সহলের উপরে ঢেলে দেওয়া হলো। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে সহল ﷺ সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠলেন। চাঙ্গা হয়ে উঠে সকলের সঙ্গে এমনভাবে চলা-ফেরা করতে লাগলেন যেন মনে হচ্ছিল, ওঁর কিছুই হয় নি। *(মা-লেক, শরহে সুন্নাহ, মিশকাত ৩৯০ পৃঃ)*

বদ-নযরের প্রভাব দূর করার জন্য যেমন শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধৌত করতঃ সেই পানি বদ-নজরগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে ঢেলে দেওয়ার কথা এসেছে -তেমনি ওর থেকে অব্যাহতি পাবার দুআও আছে। আর সে দুআ খুব কঠিন নয়; বরং খুব সহজ ও সকলের জানা। অর্থাৎ, সূরা ফালাক, ও সূরা না-স পাঠ করে ফুঁক দেওয়া।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ জ্বিনদের আক্রমণ থেকে এবং মানুষের বদ-নজরের প্রভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর যখন কূল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আব্বযু বিরাব্বিন্না-স সূরা দুটি অবতীর্ণ হলো তখন তিনি ঐ সূরা দুটিই ধরে পড়লেন এবং ঐ দুটি ছাড়া অন্য সমস্ত দুআ পরিত্যাগ করে দিলেন। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৯০ পৃঃ)*

'সিফরুস সাআদাহ' গ্রন্থের লেখক হাদীসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যখন নিজের অথবা অপরের সন্তান-সন্ততি, ধন-দৌলত ইত্যাদি দর্শন করে খুব মুগ্ধ হয়ে পড়বে, তখন সে ব্যক্তি যদি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে তবে ওই সব জিনিষে তার বদনজর লাগবে না। আয়াতটি এই,

(([illegible]))

'মা শা-আল্লাহ, লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' *(মযাহেরে হক জাদীদ ৪র্থ খন্ড ১ম কিস্তি ১০ পৃঃ) ([10])*

যাদু-মন্ত্রের কুফল দূর করার দুআ

([YT]) *বদ-নজর তথা সর্বরোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি অব্যর্থ ঝাড়-ফুঁকের দুআঃ-*

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.

উচ্চারণঃ- *বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক। (আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

বদ নজর যেমন মারাত্মক জিনিস, যাদু বিদ্যাও তেমনি সব ভয়ংকর বিষয়। এর ফলে মানুষের অনেক অঘটন ঘটে গিয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে বহুবিধ বিদ্যাচর্চার অনুমতি আছে, কিন্তু যাদু-বিদ্যার চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ মর্মে নিম্নের হাদীসটি প্রনিধান করুন ঃ-

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্যোতিষ-বিদ্যার এমন কোন বিষয় আয়ত্ব করল (যার স্বীকৃতি আল্লাহ দেন নি), সে যেন যাদু-বিদ্যার কিয়দংশ আয়ত্ব করল এবং সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ-বক্তা গণক-ঠাকুর সমতুল্য। আর ভবিষৎ-বক্তা গণক যাদুকর সমতুল্য আর যাদুকর ব্যক্তি কাফের সমতুল্য।

(মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ)

উপরোক্ত হাদীসের শেষোক্ত বাক্য [illegible] 'আস-সা-হিরু কা-ফির' অর্থাৎ, যাদুবিদ্যা চর্চাকারী কাফের, ঈমানের গন্ডী থেকে বহির্ভূত। অতএব ওর থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে তফাতে থাকা দরকার।

পক্ষান্তরে বদ-নজরের মত যাদু-মন্ত্রের কুফলজনিত মানুষের রকমারি অনিষ্ট সাধন হয়ে থাকে। এই অনিষ্টকর পরিস্থিতির মুকাবেলা করার মত ব্যবস্থা ঔষধ-পথ্যে অথবা কোন প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব হয় না। এর প্রতিকার একমাত্র বিশুদ্ধ দুআ বা ইসলামী মন্ত্র দ্বারা করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে হযরত রসূলে করীম ﷺ একটি ঘটনার উল্লেখ করা সুসঙ্গত হবে বলে মনে করি। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ও বহু জনশ্রুত ঘটনা। যথা ঃ-

খয়বর যুদ্ধের পর বড় বড় ইয়াহুদী দলপতিগণ লাবীদ বিন আসেম নামক প্রখ্যাত যাদুকরের নিকটে এসে বলল, 'আমরা মুহাম্মদের ধ্বংস-সাধনের জন্য অনেক যাদু-মন্ত্র করলাম। কিন্তু কোন কিছু করা গেল না। আপনি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যাদুবিদ। অতএব আপনি একবার যাদু-মন্ত্র দ্বারা তদবীর করে দেখুন। আপনাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।'

অতঃপর তাকে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করার কথা চুক্তি হলে সে তার তদবীর শুরু করে দিল। প্রথমতঃ সে একজন ইয়াহুদী ছেলেকে হাত করল। যে ছেলেটি নবী করীম ﷺ-এর খিদমত (সেবা) করত। চিরুনী করার সময় যে চুলগুলি দাড়ি ও মাথা থেকে চিরুনীতে লেগে বের হয়ে আসত, সেই চুল কিছু সংগ্রহ করল ঐ ছেলেটির হাত দিয়ে। তারপর সেই চুলে যাদু-মন্ত্র দ্বারা এগারোটা গিরা বেঁধে একটা কূপে পাথর চাপা দিয়ে রাখল। বাস্, এই যাদুর কুফলে নবী ﷺ প্রায় এক বছর কাল

আক্রান্ত থাকেন। এবং ভীষণ কষ্ট ভোগ করেন। পরে করুণাময় আল্লাহ হুযুরের এই কষ্ট দূরীভূত করে দেন। যাদু-মন্ত্র কে করেছে, কোথায় কি ভাবে যাদু করেছে ইত্যাদি সমস্ত খবর হুযুর ﷺ-কে জ্ঞাত করানো হলো এবং ফালাক্ব ও না-স সূরা দুটি অবতীর্ণ করা হলো। সুতরাং হুযুর ﷺ আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক যাদুকৃত চুলগুলি প্রথমে উদ্ধার করলেন। তারপর একটি করে যাদুকৃত গিরা খুলে দিতে লাগলেন। যেহেতু যাদুকৃত গিরা সংখ্যা ছিল ১১টি, সেই হেতু দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত সূরা দুটিতেও আয়াতের সংখ্যা মোট ১১টি। যখন আয়াতগুলি পাঠ করতঃ সব গিরা ক'টি খুলে দেওয়া হলো তখন নবী করীম ﷺ আরাম পেয়ে গেলেন। মনে হলো যেন তাঁকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এক্ষণে তিনি বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজেকে খুব হালকা মনে করতে লাগলেন। (ফালিল্লাহিল হাম্‌দ)। *(বিস্তারিত বিবরণের জন্য তফসীর জালালাইনের ৫০৮ পৃষ্ঠায় তফসীর ও টীকা দ্রষ্টব্য)*

বদ-নজর, যাদু-মন্ত্র, জ্বিন-ভুতের আক্রমণাদি থেকে নিষ্কৃতি পাবার নিমিত্তে উত্তম ঝাড়-ফুঁক হচ্ছে সূরা ফালাক্ব ও সূরা না-স দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। এই সূরা দুটি সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে বলেন, "আজকের রাত্রে এমন কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, ঐ রকম আর কোন আয়াত (আশ্রয় প্রার্থনা মূলক) পরিদৃষ্ট হয় না। আর সে আয়াতগুলি হচ্ছে 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন্না-স।" *(মুসলিম, মিশকাত ১৮৬ পৃঃ)*

অন্যত্রে জননী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাত্রে শয্যা গ্রহণ করতেন তখন প্রত্যহ শোবার আগে তিনি দুই হাতের চেটো দুটি একত্রিত করে তাতে নিম্নের সূরা তিনটি পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর হাত দুটি দেহে যতটা পারতেন ফিরিয়ে নিতেন। আরম্ভ করতেন মস্তক, মুখমন্ডল এবং শরীরের সম্মুখ ভাগ থেকে। এইভাবে তিনি তিনবার করে করতেন। সূরা তিনটি এই ১। কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। ২। কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। ৩। কুল আউযু বিরাব্বিন্না-স। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৬ পৃঃ)*

যাদু থেকে পরিত্রাণ পাবার আর একটি দুআ

কা'ব আল আহবার নামক জনৈক ব্যক্তি ইয়াহুদী দলের একজন খ্যাতনামা পন্ডিত ছিলেন। ইনি হযরত উমার ফারুক ﷺ-এর খিলাফতের সময় ইসলাম ধর্মে

দীক্ষিত হন। কা'ব ؓ নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'আমি যখন মুসলমান হলাম তখন ইহুদীরা আমার দুশমন হয়ে গেল। তারা আমার প্রতি শত্রুতা করতে কোন কসুর করে নি। আমি যদি নিম্নের দুআটি না পড়তাম তাহলে ওরা আমাকে যাদু মন্ত্র দ্বারা গর্ধভের রূপে রূপান্তরিত করে ছাড়ত।' দুআটি এই ঃ-

[illegible]

[illegible].

উচ্চারণ ঃ আউযু বিঅজহিল্লাহিল আযীম, আল্লাযী লাইসা শাইউন, আ'যামা মিনহু অবিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি, আল্লাতী লা য়্যুজা-বিযু হুন্না বার্রুঁউ অলা ফা-জির। অবিআসমা-ইল্লা-হিল হুসনা মা আলিমতু মিনহা অমা লাম অআ'লাম। মিন শার্রি মা খালাক্বা অযারাআ অবারাআ। *(মা-লেক, মিশকাত ঃ বাবুল ইস্তিআযাহ)*

জ্বিন-ভুত বা মানুষের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের দুআ

হাদীসগ্রন্থে এ মর্মে একটি মজাদার ঘটনা আছে। ঘটনাটি বর্ণনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একদা বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা ؓ-কে যাকাতুল ফিতরের খাদ্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হঠাৎ, একটি রাত্রে জনৈক ব্যক্তি যাকাতের ঐ গচ্ছিত সম্পদগুলি হতে দুই হাতে নিজের আঁচল ভরতে শুরু করেছে। ইহা দর্শন করে হযরত আবু হুরাইরা ؓ লোকটিকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'চলো তোমাকে হুযুর ﷺ-এর দরবারে ধরে নিয়ে যাবো।' লোকটি কাতর কণ্ঠে বলল, 'আমি অনেক ছেলে-মেয়ে নিয়ে বড় অভাবে আছি, আমাকে ছেড়ে দিন।' আবু হুরাইরা ؓ তাকে দয়া করে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকালে নবী করীম ﷺ আবূ হুরাইরা ؓ-কে বললেন, "গতরাত্রের তোমার ধৃত বন্দীটির অবস্থা কি?" (অহী মারফতে রাত্রের বৃত্তান্ত নবী করীম ﷺ জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ঐ রকম মন্তব্য করেছিলেন।) ঐ প্রশ্নসূচক মন্তব্যের উত্তরে আবূ হুরাইরা বললেন, 'ওর কাতরতা ও অভাব-দৈন্যের প্রতি আমার মায়া এসে গিয়েছিল বলে তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

হুযুর ﷺ বললেন, "তুমি সাবধান থেকো। লোকটি মিথ্যা বলেছে। দেখো আবার আসবে।"

হ্যাঁ, তাই হলো। লোকটি পুনরায় পর রাত্রিতে এসেছে এবং দুই হাতে নিজের আঁচল ভরতে আরম্ভ করেছে। পুনরায় আবূ হুরাইরা ﷺ তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'আজ অবশ্যই তোমাকে হুযুরের সমীপে ধরে নিয়ে যাব।'

লোকটি আবার সেই অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগল, 'আজ ছেড়ে দিন, আর আমি আসব না।' আজও তাকে আবূ হুরাইরা ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকাল বেলায় হুযুর বললেন, "তোমার ধৃত বন্দীর খবর কি?" আবূ হুরাইরা বললেন, 'বড় অভাবী ব্যক্তি আর সে অঙ্গীকার করেছে পুনরায় আর আসবে না। তাই আজও আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।'

হুযুর করীম ﷺ বললেন, "সে মিথ্যা বলেছে, আবার আসবে।" হ্যাঁ, সত্যিই সে আবার এসে খাদ্য-দ্রব্যগুলি ভরতে শুরু করেছে। আর আবূ হুরাইরা তাকে ধরেও ফেললেন। কড়া করে বললেন, 'আজ তোমাকে ছাড়ছি না; অবশ্যই তোমাকে হুযুরের দরবারে নিয়ে হাযির করব। আজ এই তিন দফা হয়ে গেল। আর আসব না বলেও তুমি আবার ফিরে আসছ।'

এ কথা শুনে লোকটি বলল, 'শেষ বারের মত আজও আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাকে আমি একটা কথা শিখিয়ে দেব। ওর দ্বারা আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন।

কথাটি এই ঃ যখন আপনি রাত্রে শয়ন করতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী আয়াতটি পড়ে শয়ন করবেন। এর ফলে সারা রাত্রিব্যাপী আল্লাহর তরফ হতে আপনার প্রতি একজন প্রহরী নিযুক্ত হবেন এবং শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না।'

এই মূল্যবান কথাটা শুনে আবূ হুরাইরা ﷺ সে রাত্রেও লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। পূর্ব নিয়মানুসারে সকাল বেলায় হুযুর ﷺ বললেন, "বন্দীর খবর কি? কি করে গেল সে?"

উত্তরে আবূ হুরাইরা ﷺ শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করার কথাটা শুনালেন। হুযুর করীম ﷺ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ বললেন, "(আয়াতুল কুরসী পাঠ করার উপকারিতা সম্পর্কে) সে যা বলে গেছে তা সত্যিই ঠিক কথা বলেছে। কিন্তু লোকটি আসলে ভীষণ মিথ্যুক। তিন রাত ধরে যার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হলো তাকে তুমি

জানো কি?" আবু হুরাইরা ﷺ বললেন, 'জী না।'

হুজুর করীম করীম ﷺ বললেন, লোকটি ছিল (মানুষের রূপ ধারণকারী) শয়তান।" *(বুখারী, মিশকাত ১৮৫ পৃঃ)*

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতুল কুরসী পাঠ করে শয়ন করলে রাত্রিকালে জ্বিন-ভুত, শয়তান, চোর-ডাকাত ইত্যাদির আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

নোটঃ শয়তান জানে কোন্ দুআতে শয়তান পলায়ন করে এবং মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তাই মানবরূপ ধারণকারী শয়তান উপরোক্ত আয়াতটি পড়বার কথা শিক্ষা দিয়েছে। যা যথার্থ সত্য বলে নবী করীম ﷺ স্বীকৃতি দান করেছেন। ([11])

যাবতীয় রোগে ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার দুআ

উসমানের পুত্র 'আবান' নামক জনৈক তাবেয়ী তাঁর পিতার কাছে হুযুরে করীম ﷺ-এর একটি বাণী শুনেছেন। সেই বাণীতে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় (নিম্নের) এই দুআ তিনবার করে পড়বে -তাকে (সেই দিনে ও রাত্রে) কোন রকম বিপদ আপদ, রোগ-জ্বালা আক্রমণ করবে না।

[illegible]

উচ্চারণ ঃ- বিসমিল্লাহিল লাযী লা ইয়াযুর্রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরযি অলা ফিস সামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।

হাদীস বর্ণনাকারী 'আবান' পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। তাই তাঁর মুখে হাদীসটি শুনে একজন লোক তাঁর দিকে (আশ্চর্য হয়ে) তাকাতে থাকলেন - এই ভেবে যে, আপনিই উপরোক্ত দুআর উপকারিতা বর্ণনা করলেন আর আপনাকেই এই পক্ষাঘাত ব্যাধি আক্রমণ করেছে? দুআর ঐ হাদীসটি যদি ঠিক হয়, তবে আপনার এই ব্যাধি হলো কি করে?

([11]) আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ পঠিত হয় সে গৃহ হতে শয়তান পলায়ন করে।" (মুসলিম ৭৮০ নং)

লোকটির ঐরূপ অবাক-দৃষ্টি দেখে আবান বললেন, 'তুমি আমার দিকে (অমন আশ্চর্য হয়ে) কি দেখছ? শুনো! আমি যে হাদীস তোমাকে বর্ণনা করেছি তা যথার্থ সত্য। তবে আমার তকদীরে ঐ ব্যাধিটা হবার ছিল। তাই আমি ঐ সময়ে ঐ দুআটি পাঠ করি নি।' অর্থাৎ, দুআ পাঠ করার উপকারিতা জানলে কি হবে! আমি কার্য্যতঃ ঐ দুআর প্রতি আমল করি নি। ফলে আমি রোগাক্রান্ত হয়েছি। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, মিরআত ৬ খন্ড ২০ পৃঃ)*

রোগ-জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবার আর একটি দুআ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগগ্রস্ত কিম্বা বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখে এই দুআ পাঠ করে তবে তাকে সেই রোগ কিম্বা বিপদ স্পর্শ করবে না।

[illegible]

উচ্চারণ ঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী মিম্মাব তালা-কা বিহী অফাযযালানী আলা কাসীরিম মিম্মান খালাকা তাফযীলা।

অর্থ- আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৩)*

বিপদ রক্ষার আর একটি দুআ

জনৈক সাহাবী নবী-দরবারে এসে বললেন, 'গতরাত্রে বিচ্ছু দংশনহেতু যে কষ্ট পেয়েছি ঐ রকম কষ্ট আর পাইনি।' নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি যদি এই দুআ পাঠ করতে, তাহলে ঐ বিচ্ছু তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না।"

[illegible]

উচ্চারণ ঃ আঊযু বি কালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব। *(মুসলিম, মিশকাত ২ ১৩ পৃঃ)*

দূষিত ঘা, ফোঁড়াদি সারানোর দুআ

কারো কোন দূষিত ঘা কিম্বা ফোঁড়া হলে নবী করীম ﷺ নিজের আঙ্গুলে একটু থুথু

লাগিয়ে সামান্য ধুলো মাটি মিশ্রিত করে নিম্নের দুআসহ আক্রান্ত স্থানে আঙ্গুলটি ফিরাতেন ঃ

[illegible]

(বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরযিনা ওয়া বি-রীক্বাতে বা'যিনা লিয়্যুশফা সাকীমুনা বি-ইযনে রাব্বিনা)। *(বুখারী + মুসলিম, মিশকাত ১৩৪পৃঃ)*

দূষিত বাত-বেদনাদি সারানোর দুআ

উসমান বিন আবুল আ-স নামক সাহাবী হুজুরের খিদমতে তাঁর শরীরের একটি ব্যথা-বেদনার কষ্টের কথা জানালেন। হুজুর তা শ্রবণ করে বললেন, "যেখানে তোমার কষ্ট সেখানে তোমার হাত রাখো এবং তিনবার বিসমিল্লাহ আর নিম্নের বাক্যটি সাতবার পাঠ কর ঃ

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণ ঃ- আউযু বিইয্‌যাতিল্লা-হি অকুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহাযিরু।

সাহাবী হযরত উসমান বলেন, হুজুরের নির্দেশ মত আমি তাই করলাম আর অমনি আল্লাহ পাক আমার কষ্ট দূরীভূত করে দিলেন। *(মুসলিম, মিশকাত ১৩৪পৃঃ)*

শিশুকে 'উম্মুস সিবয়্যান' ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষার উপায়

কোন কোন নবজাতক শিশুর খিঁচুনী ও অজ্ঞান অবস্থা পরিলক্ষিত হলে সাধারণ মানুষের ধারণায় তাকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বা 'ভুতে ধরা' রোগ বলে। আরাবীতে ওকেই 'উম্মুস সিবয়্যান' রোগ বলে। এই রোগের আক্রমণ থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। যথা ঃ-

হযরত হোসাইন ﷺ হতে মরফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সে তার সন্তানের (পুত্র হোক কিম্বা কন্যা) ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত

প্রদান করলে সেই সন্তানকে 'উম্মুস সিবয়্যান' রোগে ক্ষতি করতে পরবে না। *(মুসনাদে আবু ইয়ালা, জামেউস্‌সগীর, ফাতাওয়া নাযিরিয়া দ্বিতীয় খন্ড ৪৫০ পৃঃ)* [12]

শিশুদের ঐ 'খিচুনী রোগ' জ্বিন-ভুতের আক্রমণজনিত হোক, কিম্বা কোন রোগজীবাণু আক্রমণ জনিত হোক আযান ও একামতের বাক্যগুলির বরকতে ইনশা-আল্লাহ উপরোক্ত রোগাক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে পরিত্রাণ পাবার মানসে সূতিকাগৃহে লোহার দা, কাটারী, কুড়ালী রাখা বা ছেঁড়া জাল, মই, ঝাঁটা ইত্যাদি রাখা শরীয়ত বিরোধী আচরণ বা শির্ক এর অন্তর্ভূক্ত কাজ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন, যেন আমরা রোগ-জ্বালা সারানোর জন্য তাঁর প্রদত্ত 'দুআ ও দাওয়া' ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হতে পারি। পক্ষান্তরে আমরা যেন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে শরীয়ত গর্হিত কোন আচরণ অথবা শির্কমূলক কোন অপকর্মে জড়িত হয়ে না পড়ি। আ-মীন! সুম্মা আ-মীন!

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

([12]) উক্ত হাদীসটি মওযূ বা জাল হাদীস। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩২১নং, যয়ীফুল জামেউস সাগীর ৫৮৮১নং, ইরওয়াউল গালীল ১১৭৪নং। অবশ্য কানে কেবল আযান দেওয়ার কথা একটি হাসান হাদীসে এসেছে। আবূ রাফে' ﷛ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখেছি, ফাতেমা (রাঃ) হাসান বিন আলীকে প্রসব করলে তিনি তাঁর (হাসানের) কানে নামাযের আযান দিলেন। (আদাঃ ৫১০৫, তিঃ ১৫৬৬, মিঃ ৪১৫৭ নং)

পরিশিষ্ট
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইসলামের কিছু তথ্য ও নির্দেশ

রোগ-বালা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই দিয়ে থাকেন এবং তিনিই তা উপশম করে থাকেন। তিনি বিপদ-ব্যাধি দিয়ে কোন বান্দাকে শায়েস্তা করেন, কোন বান্দার ঈমান পরীক্ষা করেন, কোন বান্দার পাপক্ষয় করেন এবং কোন বান্দার মর্যাদা বর্ধন করে থাকেন। এই জন্য রোগ-বালার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল, ধৈর্যধারণ করে তাঁর কাছে উপশম চাওয়া। তাঁরই নিকট সর্বপ্রথম রুজু করা। মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং ধনপ্রাণ ও ফল-ফসলে নোকসান দিয়ে পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ দাও; যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে,

[illegible]

(আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।) এই সকল লোকেদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশিস ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সৎপথ প্রাপ্ত। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, ধৈর্য অবলম্বনের সাথে সাথে নামাযের মাধ্যমে সে রোগের আরোগ্য প্রার্থনা করতে হবে রোগীকে। যেমন মহানবী ﷺ যখন কোন সুকঠিন সমস্যায় পড়তেন, তখন শঙ্কিত হয়ে নামায শুরু করে দিতেন। *(আহমাদ, আবূ দাউদ)*

পীড়ার পীড়নে ধৈর্যের মলম ব্যবহার করলে পীড়ন দূরীভূত হয়। আর সেই সাথে ধৈর্যের প্রতিদান হিসাবে লাভ হয় জান্নাত।

একদা উম্মে যুফার নামক এক কৃষ্ণকায় লম্বা মহিলা মহানবীর দরবারে এসে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মূর্ছা (মৃগী) রোগ আছে, আর সে সময় আমি বেপর্দা হয়ে যাই। অতএব আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন (যাতে আমার সে রোগ ভালো হয়ে যায়।)' উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "যদি তুমি চাও, তাহলে ধৈর্য ধর। তার বিনিময়ে তুমি বেহেশ্ত্ পাবে। আর যদি না চাও, তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ করব। আল্লাহ তোমার রোগ নিরাময় করে দেবেন।" মহিলাটি বলল, 'আমি ধৈর্য ধরব। কিন্তু আমি যে বেপর্দা হয়ে যাই; তার জন্য দুআ করুন, যাতে আমি ঐ সময় বেপর্দা না হই!' মহানবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী ৫৬৫২, মুসলিম ২২৬৫নং)*

পর্দানশীন মা-বোনেরা ঐ বেহেশ্তী মহিলার নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন কি?

চিকিৎসায় রোগীকে প্রবোধ দানের গুরুত্ব

চিকিৎসা শাস্ত্রে চিকিৎসক বা অন্যান্য লোকের তরফ থেকে রোগীকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দানে অর্ধেক চিকিৎসা আছে। রোগী রোগকে মারাত্মক বা প্রাণহারী জ্ঞান করলে মরণ আসার আগেই সে মরতে বসে। অথচ সে জ্ঞান না দিলে অথবা তার মনে সাহস দিলে অনেক সময় রোগের চিকিৎসা সহজ হয়। আর এ জন্যই দয়ার নবী ﷺ রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়ার রীতি উম্মতের জন্য বিধিবদ্ধ করে গেছেন। বরং তিনি নিজেও রোগীকে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন সান্ত্বনা বাক্য শুনাতেন। যেমন, অনেক সময় তিনি বলতেন,

لاَ بَأسَ طَهُوْرٌ إنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণঃ- লা বা'সা ত্বাহূরুন ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ- কোন কষ্ট মনে করো না। (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে, যদি আল্লাহ চান। *(বুখারী)*

রোগীর পছন্দমত খাবার

পথ্য-অপথ্য বুঝে রোগীকে তার পছন্দমত খাবার দেওয়া কর্তব্য। যে খাবারে তার ক্ষতির আশঙ্কা আছে সে খাবার দেওয়া যাবে না। রোগী খেতে না চাইলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। খাওয়ার জন্য তার সাথে জোর করাও উচিত নয়। তার হায়াত থাকলে রোগদাতা তাকে গায়বীভাবে খাইয়ে থাকেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে পানাহারের জন্য বাধ্য করো না। (তারা না খেলেও) যেহেতু মহান আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করিয়ে থাকেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৪৩৯নং)*

সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব

মহানবী ﷺ বলেন, "সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয় ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে।---" *(আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫০ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "দু'টি নেয়ামত এমন আছে; যার ব্যাপারে বহু মানুষ ধোকার মধ্যে রয়েছে। আর সে দু'টি নেয়ামত হল সুস্থতা ও অবসর।" *(বুখারী ৯৪১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সেই কর্ম (খেলা) যাতে আল্লাহর স্মরণের পর্যায়ভুক্ত নয় তা অসার ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ স্ত্রীর সহিত প্রেমকেলি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নিজ প্রাণে নিরাপদ ও দেহে রোগমুক্ত হয়ে সকাল করে এবং তার কাছে সারাদিনের খাবার মজুদ আছে, তার কাছে যেন দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ আছে।" *(বুখারী আদাবঃ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬০৪২নং)*

তিনি বলেন, "তুমি আল্লাহর নিকট ইহ-পরকালের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা

কর।” *(বুখারী তারীখঃ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৩৬৩১নং)*

তিনি আরো বলেন, “তোমরা (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাও। কারণ, (ঈমান ও) একীনের পর নিরাপত্তা অপেক্ষা উত্তম সম্পদ কাউকে অন্য কিছু দেওয়া হয়নি।” *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৩৬৩২নং)*

তিনি বলেন, “পরহেযগার (সাবধানী) মানুষের জন্য ধন অপেক্ষা সুস্বাস্থ্য উত্তম।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৭১৮২নং)*

ইহ-পরকালে দেহ-প্রাণে নিরাপত্তাই সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে, মহানবী নিজেও এ সম্পদ মহান আল্লাহর নিকট চেয়ে নিতেন। আর জ্ঞানীরাও এ কথা অনুভব করেই বলেছেন, Health is Wealth। আর এ জন্যই জ্ঞানী লোকরা অর্থ ব্যয় করে স্বাস্থ্য আনয়ন করে, আর আহাম্মকরা স্বাস্থ্য ক্ষয় করে অর্থ উপার্জন করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

মহানবী ﷺ বলেন, “(সংক্রামক) কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোক থেকে সেই রকম পলায়ন কর, যে রকম বাঘ দেখে পলায়ন কর।” *(বুখারী ৫৭০৭নং, আহমাদ ২/৪৪৩)*

“কোন স্থানে তা (প্লেগরোগ) চলছে শুনলে সেখানে যেও না। আর সেখানে তোমাদের থাকাকালে তা শুরু হলে সেখান হতে তার ভয়ে পলায়ন করো না।” *(বুখারী ও মুসলিম, সহীহুল জামে’ ৬১৬-৬১৭নং)*

সংক্রামক ব্যাধির সংস্পর্শে থাকলেই যে সে ব্যাধি সংক্রমণ করবে - তা নয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কোন ব্যাধি স্পর্শ করতে পারে না। আর তাঁর ইচ্ছা হলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। অবশ্য সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। *(কুঃ ৪/২৯)*

তিনি আরো বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। *(কুঃ ২/১৯৫)*

হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরেরও ক্ষতি করবে না।" *(আঃ, ইমাঃ, হাঃ, বাঃ, দারাঃ, সিসঃ ২৫০নং)*

সুস্বাস্থ্য বিধানে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, সবচেয়ে নোংরা আঙ্গিনা হল ইয়াহুদীদের আঙ্গিনা।" *(সহীহুল জামে ৩৯৪১নং)* অর্থাৎ, বাড়ির সম্মুখভাগকে অপরিষ্কার করে রাখা কোন মুসলিমের কাজ নয়। সে কাজ হল ইয়াহুদীর।

বৃক্ষ-রোপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পরিবেশ-বিজ্ঞানী মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ১৪২৪নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "যে কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকাহ (করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ) হয়।" *(বুঃ ২৩২০নং)*

সুস্বাস্থ্য বিধানে পরিমিত পানাহারের গুরুত্ব

মহানবী ﷺ বলেন, "মুসলিম একটি মাত্র অন্ত্রে খায়, পক্ষান্তরে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।" *(বুখারী ৫৩৯৬, মুসলিম ২০৬২নং, ইবনে মাজাহ)*

"উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয় তাহলে যেন সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১২১, সহীহুল জামে' ৫৬৭৪নং)*

খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেঁটে খাওয়ার গুরুত্ব

এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন সে যেন তার আঙ্গুল চেঁটে বা চাঁটিয়ে না নেওয়ার আগে তা না মুছে (বা না ধোয়)।" *(বুঃ, মুঃ)*

খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেঁটে খাওয়ার গুরুত্ব বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। কারণ, আঙ্গুলের মাথা হতে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, যা খাদ্য হজম হওয়াতে সাহায্য করে। আর এ জন্যই তরকারীতে আঙ্গুল ডোবালে তরকারী খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়।

সুস্বাস্থ্য বিধানে খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখার গুরুত্ব

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের খাদ্যের পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, (ঢাকার কিছু না থাকলে অন্ততঃপক্ষে একটি কাষ্টখন্ড বা অন্য কিছু দ্বারা ঢাক) পানির মশকের মুখগুলোও বেঁধে রেখো, নচেৎ খোলা পাত্রে বা মশকে ব্যাধি (রোগজীবাণু) এসে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

চিকিৎসায় যমযম পানির মাহাত্ম্য

মহানবী ﷺ বলেন, "যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৮৮৪ নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বর্কতপূণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগনিরাময়ের ঔষধ।" *(ত্বাবরানী, বাযযার, সহীহুল জামে' ২৪৩৫ নং)*

পরীক্ষিত যে, যমযমের পানি বহু রোগের ঔষধ। আর এও পরীক্ষিত যে, পানীয় হওয়ার সাথে সাথে তা এক প্রকার খাদ্য। একাধিক মানুষ অন্য খাদ্য না খেয়ে এবং কেবলমাত্র যমযমের পানি খেয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত থাকতে সক্ষম হয়েছেন। *(আত্-ত্বিব্বুন নাবাবী ৩৯৩পৃঃ, ইরওয়াউল গালীল ৪/৩২৪)*

উবুড় হয়ে শোয়া ভাল নয়

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তখন সে উবুড় হয়ে শুয়ে ছিল। তিনি নিজ পা দ্বারা তাকে স্পর্শ করে বললেন, "এ ঢঙের শয়নকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ পছন্দ করেন না।" *(আহমদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে' ২২৭০ নং)*

শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে দুপুরে বিশ্রামের গুরুত্ব

সকাল থেকে মেহনতের পর দুপুরের সময় বিশেষ করে গ্রীষ্মের দিনে খাওয়ার পর একটু শুয়ে বিশ্রাম নিলে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয় এবং সেই সাথে বিকালের দিকে কাজ করতে আলস্য আসে না। এ জন্যই মহানবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা দুপুরের সময় বিশ্রাম নাও। শয়তানরা এ সময় বিশ্রাম নেয় না।" *(ত্বাবারানী, আবূ নুআইম, সহীহুল জামে' ৪৪৩১নং)*

সর্দিগর্মি (Sunstroke) থেকে সাবধানতা

কেউ রোদে দাঁড়ালে এমন কি রোদে দাঁড়াবার মানত মেনেও রোদে দাঁড়ালে মহানবী ﷺ তাকে রোদ ছেড়ে ছায়াতে যেতে আদেশ করতেন।

একদা তিনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা বলল, 'আবূ ইসরাঈল, সে এই নযর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা পালন করবে!' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "ওকে আদেশ কর, যেন ও কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে যায় এবং রোযা পূরণ করে।" *(বুখারী, আবূ*

দাউদ ৪৮২২, মিশকাত ৩৪৩০ নং)

মহানবী ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "(রোদ ও ছায়ার মাঝে বসা হল) শয়তানের বৈঠক।" *(আহমদ ৩/৪১৩, হাকেম ৪/২৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৩৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের কেউ যদি (শীতকালে) রোদে বসে (অথবা শোয়), অতঃপর ছায়া চলে এলে তার অর্ধেক দেহ রোদে এবং অর্ধেক দেহ ছায়ায় হয়ে যায়, তাহলে সে যেন সেখান থেকে উঠে যায়।" *(আবূ দাউদ ৪৮২১নং)*

একপায়ে জুতো দিয়ে না চলার গুরুত্ব

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো একটি জুতা অচল হয়ে গেলে কেবল এক পায়ে জুতা নিয়ে না চলে। হয় সে সচল করে উভয় পায়ে জুতা রেখে চলে, নচেৎ উভয় পা খালি রেখে (খালি পায়ে) চলে। *(বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭নং)*

না জেনে ডাক্তারি

সমাজে অজ্ঞ, আনাড়ি ও হাতুড়ে ডাক্তারের অভাব নেই। যাঁরা পয়সার জন্য না জেনে আন্দাজে ডাক্তারি করে থাকেন। যার ফলে অনেক সময় তাঁদের কুচিকিৎসার কারণে অনেক রোগীর রোগ বৃদ্ধি পায় অথবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয় অথবা রোগী মারা গিয়ে থাকে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ হত্যার জন্য তাঁরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ডাক্তারি করে, অথচ ডাক্তারি করা তার কাজ নয়, সে ব্যক্তি (রোগীর জন্য) যামিন।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬১৫৩নং)*

কথায় বলে, 'নীম মুল্লা খাতরায়ে ঈমান, নীম হাকীম খাতরায়ে জান।' অতএব রোগ, ওযুধ ও রোগীর পরিস্থিতি বুঝেই ডাক্তারি করা কর্তব্য।

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, বান্দা যখন যে কাজ করে, তখন তা যেন সে নৈপুণ্যের সাথে করে।" *(শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, সহীহুল*

জামে' ১৮৮০নং)

পরিশেষে বলাই বাহুল্য যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষের প্রতি বড় দয়াবান। তিনি রোগ সৃষ্টি করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাও প্রদান করেছেন। আর সেই সাথে আধি ও ব্যাধি, মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার চিকিৎসা স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহাচিকিৎসক ও 'করুণা' স্বরূপ প্রেরণ করেছেন মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে।

﴿[illegible]﴾

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার কাছে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াবান। *(সূরা তাওবাহ ১২৮ আয়াত)*

বিশ্বের মানুষ যদি ইসলামের অনুসরণ করে, তাহলে পৃথিবীর অশান্তির আকাশ শান্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। প্রত্যেক মানুষ পাবে তার দেহে শান্তি, তার মনে শান্তি। এতে কোন সন্দেহ নেই।

اللهم أعز الإسلام والمسلمين.

وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

কলিকাতা ইসলামিয়া হাসপাতালের সুখ্যাত চিকিৎসক
জনাব ডাঃ শওকাত আলী (এম, বি, বি-এস) সাহেব
বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা সম্পর্কে বলেন ঃ-

আমরা ওযূ করে নামায পড়ি, বৎসরান্তে একমাস রোযা রাখি; আধ্যাত্মিকতা ও নেকীর উদ্দেশ্যেই আমরা এগুলো করি। কিন্তু এগুলোতে যে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যেরও কল্যাণ রয়েছে - তা এই বইটিতে জেনে আমি খুবই মুগ্ধ। শূকর মাংস ভক্ষণ করার ও মাদক দ্রব্যের অপকারিতার বিষয় দুটি পড়ে কুরআন ও হাদীসের প্রতি মানুষের ভক্তি বাড়বেই। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ যে এত উন্নত মানের - তা ভেবে আমি অবাক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিষয়ে ইসলামই যে মূল পথ নির্দেশনা করেছে - তা বইটি পড়লে উপলব্ধি করা যাবে। বইটি পড়তে পড়তে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়! হয় তো সবগুলি ব্যাখ্যা সম্পর্কে সকলে একমত হবেন না। তা সত্ত্বেও আমার চিন্তার দরজা উন্মুক্ত করতে এগুলির তুলনা নেই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ আঃ রউফ শামীম সাহেব বইটিতে কুরআন ও হাদীসের যে জটীল বিষয়ের আলোকপাত করেছেন - তা ভবিষ্যতে অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা লেখকের নিকট থেকে এমনই অনেক তথ্যপূর্ণ পুস্তক পাবার কামনা করি।

ইতি -
মোঃ শওকাত আলী
ইসলামিয়া হাসপাতাল
কলিকাতা
২৭শে জুলাই ১৯৮৬